Q. সংস্কৃতির সংজ্ঞা (Defination of culture)

সমাজ তত্ত্বে অন্যতম মুখ্য পদ প্রত্যয় হলো সংস্কৃতি। সংস্কৃতি হলো একটি বাংলা শব্দ। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হল "Culture". এই ইংরেজী শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ "colere" থেকে. এই ল্যাটিন শব্দটির অর্থ হল কর্ষণ করা, সুতরাং সংস্কৃতি বা 'culture' হল কর্ষণের ~~সংস্কৃতির~~ মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয়। অতএব বুৎপত্তিগত অর্থে সংস্কৃতি ~~হল~~ বলতে বোঝায় সংস্কারের বা মার্জনার মাধ্যমে প্রাপ্ত। সুতরাং এই অর্থে সংস্কৃতি হল ব্যক্তি মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, বিচার-বুদ্ধি, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, প্রভৃতির সংস্কৃত বা মার্জিত রূপ।

অক্সফোর্ড ইংলিশ ~~ডিকশীনা~~ ডিকশনারী অনুসারে culture শব্দের অর্থ হল—

> পরিশীলিত মন, মার্জিত রুচি ও ব্যবহার, সভ্যতার বিদ্যা বুদ্ধির দিক।

— আবার বাংলা অভিধানে সংস্কৃতি শব্দের অর্থ করা হয়েছে—

> "সভ্যতা জনিত উৎকর্ষ"

— এর অর্থ করলে দাঁড়ায়— জীবন যাত্রা প্রণালীর যে উৎকর্ষ তাই মানুষের সংস্কৃতি।

জন ডিউই (John Dewey) সংকীর্ণ অর্থে সংস্কৃতি শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। তার মতে সংস্কৃতি বলতে বোঝায়—

> যা অনুশীলিত হয়েছে, যা পরিপক্কতা লাভ করেছে, যা অপক্ক এবং অশোভনীয়ের বিপরীত।

— সুতরাং বলা যায় যে সংকীর্ণ অর্থে সংস্কৃতি বলতে আচার আচরণ ও ব্যবহারের বিশেষ পরিশীলিত অবস্থাকেই বুঝিয়ে থাকে।

সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষা হিসাবে সংস্কৃতি শব্দটি অনেক ব্যাপক অর্থ বহন করে। সংস্কৃতির অন্যতম আদি ব্যাখ্যাকার ই. বি. টাইলর (E.B. Tylor) এর মতে—

> সমাজের সদস্য হিসাবে মানুষ যেসব জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নৈতিক বিধান, আইন প্রথা এবং অন্যান্য যে সমস্ত গুণ ও অভ্যাস অর্জন করে তারই জটিল সমষ্টি হচ্ছে সংস্কৃতি।

— এই দৃষ্টিভঙ্গীতে কোন থেকে বলা যায় যে মানুষের যাবতীয় আচরণের সমষ্টিই — হলো সংস্কৃতি।

আবার সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কুলী;এনহেল, ও কার বলেন, —

> একত্রে বাস করার সাবিক ফলশ্রুতি
> যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে
> সঞ্চারিত — তাই হচ্ছে সংস্কৃতি

— আবার প্রখ্যাত সমাজ নৃতাত্ত্বিক ম্যালিনোস্কির (Malinowski) এর মতে সংস্কৃতি হচ্ছে —

> মানব সৃষ্ট এমন কৌশল বা উপায়
> যার মাধ্যমে সে তার উদ্দেশ্য
> চরিতার্থ করে।

সুতরাং, সংস্কৃতি হল আমাদের পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক তথা সৌন্দর্য সম্পর্কিত যাবতীয় প্রয়োজন গুলিকে কেন্দ্র করে যে জীবন সংগ্রাম গড়ে ওঠে তারই সম্মিলিত প্রতিরূপ, সংস্কৃতি কোন প্রকার ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণী — অধিকার যুক্ত নয়, এটি সার্বজনীন, বিমূর্ত, অজানুরান এবং গন্ডীহীন। এখানেই মানবজীবনের পূর্ণতা লাভ করে।

অর্থাৎ সংস্কৃতির মৌল বিষয় গুলি প্রত্যক্ষ করে বলা যায় যে —

① সংস্কৃতি হল সমাজের সামগ্রিক চর্চার বিষয়,
② সংস্কৃতি মানব সমাজের সার্বিক আচরণ-বিধির একত্রিত রূপ,
③ সংস্কৃতি হল মানবজীবনের পরিপূর্ণতা
④ সংস্কৃতি হল একটি বিমূর্ত রূপ, যার কোন গন্ডী নেই,
⑤ সংস্কৃতি স্পর্শ সাপেক্ষ নয়, অনুভূতি সাপেক্ষ।
⑥ সংস্কৃতি কোন বস্তুগত উপাদান দ্বারা পরিলক্ষিত হয় না,
⑦ সংস্কৃতি কোন গোষ্ঠী বা শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার নয়, এটি সমগ্র মানব প্রজাতির।
⑧ সংস্কৃতি সহজাত নয়, ব্যক্তিপ্রয়াসের মধ্যে দিয়ে তা প্রকাশিত হয়।
⑨ সংস্কৃতিতে থাকে বোধের প্রাধান্য।
⑩ সংস্কৃতি ব্যক্তিগত অনুশীলনের বিষয় নয়, সমগ্র গোষ্ঠী জীবনের অনুশীলনের বিষয়,
⑪ সংস্কৃতি সদা পরিবর্তন শীল, দৃষ্টিভঙ্গীগত পরিবর্তনের সাথে সংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটে, তবে তা ঘটে ধীরগতিতে।

সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সমূহ:

(১) সংস্কৃতি হলো মানুষের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জীবন যাপনের ধারার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা। মনুষ্যেতর প্রাণীর পক্ষে কোন সংস্কৃতির ঐতিহ্য গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সংস্কৃতিবিহীন মানবসমাজের কথা কল্পনা করা যায় না।

(২) সংস্কৃতি সহজাত নয়। অভিজ্ঞতা অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে সংস্কৃতিকে রপ্ত করতে হয়। সংস্কৃতি আহরণের এই প্রক্রিয়াকে সমাজতত্ত্বের পরিভাষায় সামাজিকীকরন বলে অভিহিত করা হয়।

(৩) বস্তুগত ও অবস্তুগত - উভয় উপাদানের সংমিশ্রনে সংস্কৃতি গঠিত হয়। জৈবিক, পারিবেশগত, মনস্তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক = বিভিন্ন উপাদান থেকে সংস্কৃতি গঠিত।

(৪) সংস্কৃতি সদা পরিবর্তন শীল।

(৫) সংস্কৃতি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত শিক্ষা বা অনুশীলনের বিষয় নয়। সমাজের সদস্য হিসাবেই মানুষ সামাজিকীকরনের মাধ্যমে সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। এই দৃষ্টিকোন থেকে বলা যায় যে, সংস্কৃতি হলো যৌথ এবং অংশীদার মূলক।

(৬) সংস্কৃতি শূন্যে অবস্থান করেনা। সংস্কৃতি হচ্ছে কাঠামো ভিত্তিক; কাঠামোভিত্তিক রূপের মাধ্যমে সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে। সংস্কৃতির এই রূপটি বস্তুগত বা অবস্তুগত উভয় ধরনেরই হতে পারে।

(৭) সংস্কৃতি সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি, শুধু মানুষই সংস্কৃতির অধিকারী। সংস্কৃতি সামাজিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

(৮) সামাজিক অবস্থা ভেদে সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য যেমন আছে, তেমনি সাদৃশ্যও আছে। মানুষের চিন্তা-চেতনা, আচার- আচরন, ও সংগঠনের মাধ্যমে প্রকাশিত সংস্কৃতি সর্বযুগে ও সবজায়গায় একরকম হয়না।

(৯) সংস্কৃতির মধ্যে যেমন আদান প্রদান হয় আবার এর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও দেখা যায়।

(১০) মানব সংস্কৃতির বৈচিত্র্য অত্যন্ত স্পষ্ট। আচার-আচরন এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে ভিন্ন। যেমন ইউরোপিয়ান সমাজে যে আচরন গুলিকে স্বাভাবিক বলে মনে করা হয় অন্য সমাজে অনেক সময় তা স্বাভাবিক বলে নাও ভাবা হতে পারে। প্রতিটি সংস্কৃতির নিজস্ব আচরনের ধারা আছে যা অন্য সংস্কৃতি থেকে অনেকাংশে আলাদা।

— বস্তুগত সংস্কৃতি ও অবস্তুগত সংস্কৃতির বিপরীত ধর্মী প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক সমাজতাত্ত্বিক এই উপাদান গুলিকে যথাক্রমে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলে অভিহিত করেছে। —০—

Q. What are the causes of culture change? Discuss the role of Education in cultural changes?

Ans: সমাজবদ্ধ মানুষের বিশিষ্ট পরিচয় হল সংস্কৃতি, মানুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা যায় সংস্কৃতির মাধ্যমে, অধ্যাপক Kingsley বলেছেন - মানুষের অর্থপূর্ণ অস্তিত্ব হল সংস্কৃতির দান।

Society means people and culture means the behaviour

এই সংস্কৃতি সদা পরিবর্তন শীল কখনো স্থিতিশীল নয়, যুগ ও দিন পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চিন্তা ভাবনার ক্রম অগ্রগতি ঘটেছে, ফলে এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মের সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে চলেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সংগীত, সাহিত্য, আচার-আচরন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে নতুন নতুন চিন্তা ভাবনার প্রসার হয়ে চলেছে, অহরহ জ্ঞান-বিজ্ঞান, ও প্রযুক্তিবিদ্যার যে উন্নতি ঘটেছে তার ফল স্বরূপ যে নতুন নতুন, নতুন নতুন চিন্তা, চেতনা ও মতাদর্শের যে উন্মেষ ঘটেছে সেই দিক অনুসারে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কারন গুলি হল ——

i) **মানসিক ধারনা ও মূল্যবোধের প্রকাশ :-**

সংস্কৃতির বাস্তব উপাদান গুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল মূল্যবোধ ও ব্যক্তির আদর্শ। এগুলি এগুলি সংস্কৃতির পরিচয় বাহক এবং সংস্কৃতির বহিরাঙ্গ। এগুলি পরিবর্তনে সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে।

ii) **সামাজিক ব্যক্তিবর্গের মানসিক অনুভূতি:**

(সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের আদর্শ, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারনা, আনন্দ-বেদনা, এগুলি সংস্কৃতির পরিবর্তনকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করে।) সংস্কৃতির এই প্রতীক মূলক দিকগুলি ফুটে ওঠে মানুষের অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতায়, যেমন— সঙ্গীত, সাহিত্য, নাটক, শিল্প-দর্শন ইত্যাদি।

iii) **সামাজিক উপাদান সমূহের মধ্যে যোগসূত্রতা:**

সমাজের বিভিন্ন উপাদান গুলির মধ্যে যে যোগসূত্র বর্তমান সেগুলি থেকেই গড়ে উঠেছে সংস্কৃতি, তাই ব্যক্তিবর্গের চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপের যোগসূত্রতা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের এক অন্যতম কারন।

iv) **সংস্কৃতির উপাদান সমূহের সামঞ্জস্যতা:**

সমাজের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে যে পারস্পারিক সমন্বয় বা সামঞ্জস্য বর্তমান তা সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান ~~গুলিকে~~ গুলিকে পরিবর্তন ঘটায় এবং

সেগুলির দ্বারা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন নতুন পরিবর্তন নিয়ে আসে

v) সংস্কৃতিগত প্রলক্ষন :

বিভিন্ন সমাজে ছড়িয়ে আছে বহুবিধ সাংস্কৃতিক-প্রলক্ষন। যেগুলির জন্য সমাজের সংস্কৃতিতে নানা রূপ পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। যেমন— পোষাক-আষাক, খাদ্যাভ্যাস, রন্ধন প্রনালী ইত্যাদি।

vi) প্রলক্ষনের সঙ্গতিপূর্ন অবস্থান:

বিভিন্ন বিষয়ে যে প্রলক্ষন দেখতে পাওয়া যায় তাদের সামঞ্জস্যপূর্ন সমাবেশের ফলে সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের উদ্ভব হয়, ফলে সংস্কৃতির মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা যায়। (যেমন আদি) খাদ্য, আগুন, কর্মপদ্ধতি, ব্যবহারের বিভিন্নতা ইত্যাদি।

vii) অতীত সংস্কৃতির ধারা:

পৃথিবীর প্রত্যেকটি সমাজের অতীত স্বতন্ত্র ধারা থাকে। এই অতীত ধারা বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত হয়। এই সময়ের পথে বিবর্তিত হয়ে ~~ভবিষ্যতের~~ সংস্কৃতি কখনো অল্প আবার কখনো বিস্তর পরিবর্তন ঘটায়।

viii) গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের মিথস্ক্রীয়া:

সংস্কৃতির অভ্যন্তরে গোষ্ঠী জীবনের যে মিথস্ক্রীয়া বর্তমান তা ক্রমে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়। এই পরিমার্জন ও পরিবর্তন সংস্কৃতির পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।

ix) সমাজের ধারা :

সমাজকে সাথে নিয়েই সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়। এই সমাজের প্রত্যেকটি দিক সংস্কৃতির পরিবর্তনকে কখনো ক্ষুদ্র পরিসরে কখনো বৃহত্তর পরিবেশে প্রসারিত করে।

x) সামাজিকীকরন -:

সামাজিকী করনের মাধ্যমে ব্যক্তি যে উপাদান গুলি আয়ত্ব করে তার দ্বারা ব্যক্তির জীবন যেমন প্রভাবিত হয়, তেমনি সমাজের সংস্কৃতিও প্রভাবিত হয়।

xi) সামাজিক রীতিনীতি ও ঐতিহ্য -:

সামাজিক রীতি-নীতির ও ঐতিহ্যের সামগ্রিক রূপ হল সংস্কৃতি, অতএব সেগুলির পরিবর্তনে সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত।

xii) সামাজিক কল্যান ও সামাজিক দায়বদ্ধতা:

সংস্কৃতির সাথে সমাজ বদ্ধ মানুষের সামাজিক দায়বদ্ধতা গভীর ভাবে সম্পর্ক যুক্ত। তাই তাদের ~~দায়বদ্ধ~~ দায় বদ্ধতার মাত্রার উপর সংস্কৃতির বিভিন্ন মাত্রায় পরিবর্তন হয়।

xiii) সামাজিক সংহতি :

সমাজে নানা রূপ অসংহতির প্রভাব থেকে সংহতিকে সংরক্ষিত রাখা হয়। ফলে সংস্কৃতির অব্যাহত থাকে। কিন্তু অসংহতির পরিবেশ সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে।

xiv) সংস্কৃতির বাহক :

সংস্কৃতির ধারাকে যথাযথ রাখতে হলে সংস্কৃতির প্রবাহের বাহক গুলিকে অব্যাহত রাখতে হবে। কারন– সংস্কৃতির বাহক গুলির কারনেই সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়। যেমন— সামাজিক প্রথা, রীতি – নীতি ইত্যাদি।

xv) সমাজে প্রচলিত ব্যবস্থা :

সমাজে প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা, আদর্শ, বিশ্বাস প্রভৃতি থেকে শিশু মনে যে শিক্ষা-দীক্ষার বীজ গ্রথিত হয় তার প্রভাবে সংস্কৃতি পরিচালিত হয়।

Discuss the role of education in cultural change:

~~সমা~~ সমাজবদ্ধ মানুষ সমাজের সংস্কৃতির মতো বিবর্তনের পথে পরিমার্জনা, সংযোজন ও সম্প্রসারণ দ্বারা সংস্কৃতির স্বতন্ত্র ধারা বজায় রেখেছে। সবার জীবনে সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। সংস্কৃতির ওতপ্রোত সমাজের অনেক গভীরে প্রোথিত। সংস্কৃতির প্রয়োজন যেমন সমাজ জীবনে তেমনি মানব-জীবনেও এর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গভীর। ব্যক্তির সামাজিক জীবন ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত হয় সংস্কৃতির মাধ্যমে, প্রত্যেক সমাজে পূর্ব নির্ধারিত কতকগুলি প্রথা, আচার-আচরণ নির্দিষ্ট থাকে। যার ফলে মানুষ যখন কোন বিশেষ পরিবেশে আচরণ করে সেই আচরণের প্রকৃতিকে নির্দিষ্ট রাখে, শিক্ষার সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক একই মুদ্রার দুটি পিঠ। সংস্কৃতি শিক্ষার সাথে যেমন যুক্ত হয় তেমনি শিক্ষাও সংস্কৃতি থেকে অনেক রসদ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

▨ সমাজজীবন ও শিক্ষা :

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে থাকার ফলে শিশুর মধ্যে একটি সংস্কৃতি মূলক আদর্শ গড়ে ওঠে যা তাকে ভবিষ্যতে যথার্থ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। বিভিন্ন সমাজ পরিবেশে শিশু কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করবে সেই শিক্ষাও শিশুকে দেয় সংস্কৃতি। সংস্কৃতির মাধ্যমে সুসংবদ্ধ ব্যক্তি জীবন লাভ করা সম্ভব হয়। শৈশব কাল থেকে সমাজের সংস্কৃতিকে সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ করে শিক্ষা। তাই সেই শিক্ষা দ্বারা গঠিত সংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে শিশু বিভিন্ন বিষয়ে স্বচ্ছ ধারনা লাভ করে এবং সুখী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়। যেমন — পোশাক-পরিচ্ছেদ, আচার - আচরন, খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক সম্পর্ক গঠন, সামাজিক রীতি - নীতি ইত্যাদি।

▨ সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গী ও শিক্ষা :

ব্যক্তির সমাজ জীবনে সংস্কৃতি ও শিক্ষা পরস্পরের সমন্বয়ে ব্যক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত সামাজিক দৃষ্টি-ভঙ্গী গড়ে তোলে, যার ফলে ব্যক্তির জীবন প্রবাহ সমাজ ও স্বাচ্ছন্দ যুক্ত হয়। যেমন—

i) সংস্কৃতি ও শিক্ষা সকল সদস্যদের একাত্মবোধ জাগ্রত করে।

ii) সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পারস্পারিক সহযোগীতার মনোভাব গড়ে তোলা।

iii) পারস্পারিক সহমর্মিতা এবং সহানুভূতির দৃষ্টি ভঙ্গী গড়ে ওঠে।

iv) সংস্কৃতির মাধ্যমে সমাজ চেতনা সৃষ্টি হয়।

v) সমাজের সংস্কৃতির ঐতিহ্য প্রত্যেক সদস্যদের মধ্যে সংহতি ও শৃঙ্খলা বোধ জাগ্রত করে।

vi) বিরোধি শক্তির মোকাবিলায় সামাজিক শক্তিকে দৃঢ় করে সংস্কৃতি ও শিক্ষা।

vii) সামাজিক বন্ধনকে অটুট রাখে যে সমাজ তাকে নিয়ন্ত্রিত করে একদিকে শিক্ষা ও অন্যদিকে সংস্কৃতি।

viii) সামাজিক নিয়ন্ত্রনে কার্যকারী ভূমিকা পালন করে সংস্কৃতি ও শিক্ষা।

ix) মানুষের মনে মূল্যবোধ জাগিয়ে [illegible] তোলে সংস্কৃতি এবং আদর্শ শিক্ষা।

খ) গোষ্ঠী বদ্ধ জীবনকে সুসংবদ্ধ, সুসংহত এবং গতিশীল রাখে সংস্কৃতি।

সুতরাং সংস্কৃতি ব্যক্তিজীবনকে এবং গোষ্ঠী জীবনকে সুখী ও সুন্দর রাখে, শিক্ষাবিজ্ঞান তার নিজস্ব প্রক্রিয়া দ্বারা সংস্কৃতিকে সুসংহত, সুসংবদ্ধ, নিয়ন্ত্রন ও সুশৃঙ্খল করে। প্রতিনিয়ত সংস্কৃতি নানা কারনে পরিবর্তিত হয়। সেই পরিবর্তনকে মানুষের জীবন বিকাশের পথে নিয়ে আসে শিক্ষা বিজ্ঞান। সংস্কৃতির পরিবর্তনকে যদি শিক্ষা বিজ্ঞান ছাড়পত্র না দেয় বা তাকে জীবন পথে প্রবাহিত না করে তবে সেই পরিবর্তন দীর্ঘস্থায়ী হয় না, অতএব কোনো সংস্কৃতির পরিবর্তনকে আদর্শায়িত হতে হলে তাকে শিক্ষাবিজ্ঞানের ধারাতে যুক্ত হতে হবে, তবেই সেই পরিবর্তন আদর্শ পরিবর্তন হবে।

সকল সমাজে থাকে যে সংস্কৃতি তা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের মঙ্গলে সাধনে সর্বদা গুরুত্ব পূর্ন এক সহায়ক উপাদান রূপে ক্রিয়াশীল। শিক্ষাবিজ্ঞান সংস্কৃতির সেই প্রবাহমান তার পথ তৈরী করে দেয়। শিক্ষাবিজ্ঞানের এই পথেই সংস্কৃতি নতুন থেকে নতুন মাত্রায় সংযোজিত হয় এবং ব্যক্তিজীবনকে সমৃদ্ধ করে। আবার শিক্ষাবিজ্ঞানের পথেই সংস্কৃতির কোন পরিবর্তনের পথ অবরুদ্ধ হয়ে যায়। তাই শিক্ষা বিজ্ঞানকে আকরে ধরেই সংস্কৃতিকে চলতে হয়। এবং তার পরিবর্তনকে যথাযথ করে তুলতে হয়।

Q. What is cultural lag? What are is causes?

Lag শব্দের অর্থ হল গতির বিঘূরণ। Cultural lag বলতে বোঝায় সংস্কৃতির একদিক অন্যদিকের তুলনায় পিছিয়ে পড়া বা পশ্চাদবর্তীতা। সংস্কৃতির দুটি উপাদান আছে বস্তুগত উপাদান বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদান (material) এবং অবস্তুগত বা মানসিক উপাদান (non-material)। এই দুটি উপাদানের মধ্যে একটি যদি অপরটি থেকে পিছিয়ে থাকে একেই বলে সাংস্কৃতিক পশ্চাদপতীতা। সাধারনত অবস্তুগত উপাদান অপেক্ষা বস্তুগত উপাদানের উন্নয়ন দ্রুত ঘটে।

প্রখ্যাত সমাজবিদ W. F. Ogburn তার লিখিত পুস্তক Social Change এ প্রথম সাংস্কৃতিক পশ্চাদবর্তী ধারনাটি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন সাধারনত বস্তুগত উপাদানের অগ্রগতি অবস্তুগত উপাদানের অপেক্ষা দ্রুত ঘটে এই অবস্থাকেই সাংস্কৃতিক পশ্চাদবর্তীতা বলা হয়। তিনি তার পুস্তকে সাংস্কৃতিক পশ্চাদবর্তীতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন —

> সংস্কৃতির মধ্যে পরস্পর সম্পর্কিত দুটি অংশের অসম পরিবর্তনকে পশ্চাদবর্তীতা বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

— পশ্চাদবর্তী সেই অংশ যার উন্নতি অপর অংশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম।

উদাহরন— ভারতবর্ষে বহুপ্রকারের সাংস্কৃতিক পশ্চাদবর্তীতা দেখা যায়। বিগত দুশো বছর ধরে বস্তুগত সংস্কৃতিকে আমাদের দেশে নিয়ে আসা হয়েছে। বাহ্যিক দিক থেকে ভারতবর্ষের শহরগুলি যেমন ~~দিল্লী~~ দিল্লি কোলকাতা, মুম্বাই, মাদ্রাজ শহরগুলি কোন অংশেই পাশ্চিমের উন্নত শহরগুলি অপেক্ষা বস্তুগত উপাদানে ঘাটতি নেই। অর্থাৎ বিগত দুশো বছরে বস্তুগত উপাদানের এক বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু সাংস্কৃতিক অবস্তুগত উপাদানের দিক থেকে খুব সামান্যই পরিবর্তন ঘটেছে। শিক্ষার দিক থেকে পাশ্চিম দুনিয়া থেকে যা আমরা নিয়ে এসেছি তার মধ্যে বস্তুগত উপাদানের তুলনায় অবস্তুগত উপাদানে আমরা পিছিয়ে আছি। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল ভারতীয় নারীদের পিছিয়ে থাকে। বর্তমানে আমাদের দেশে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় জীবনে মহিলাদের ভূমিকা উপেক্ষা করার মত নয়। তা সত্ত্বেও অনুভূতি, চিন্তাভাবনা, বিশ্বাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে পাশ্চিমের নারীদের তুলনায় আমাদের দেশের মহিলাদের পশ্চাদবর্তীতা লক্ষনীয়।

আবার ফ্যাশান, পোশাক-আশাক, কৃত্রিম সৌন্দর্যায়ন, কলা, বিনোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন দ্রুত পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীগুলির পরিবর্তন এক্ষেত্রে অত্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন। ~~[illegible]~~ এটি একটি সাংস্কৃতিক বিলম্ব।

Causes of cultual lag (সাংস্কৃতিক বিলম্বনের কারন)

সাংস্কৃতিক বিলম্বনের কারন কি? এই নিয়ে নানা মতামত আছে। এগুলি যেমন আর্থসামাজিক হতে পারে, আবার রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, মনস্তাত্ত্বিক এমনকি জনসংখ্যা ও হতে পারে। এর মধ্যে প্রধান কারন গুলি হলে—

▨ সংস্কৃতির উপাদান গুলির চলন গত বৈষম্য ।।

বিলম্বন প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান কারন সাংস্কৃতিক উপাদান গুলির চলন গত বৈষম্য। যেমন—

> ধর্মীয় মতামতগত ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল গতিপ্রকৃতি অত্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন। ফ্যাশান, পোশাক-পরিচ্ছদ, সৌন্দর্য বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গীগুলির কয়েক শতকীর পরিবর্তিত গতিপ্রকৃতির সঙ্গে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, প্রভৃতি গোষ্ঠীগত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন গুলি অত্যন্ত নগন্য।

▨ সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের স্থায়ীত্ব ।।

সাংস্কৃতিক বিলম্বন সমাজের একটি বাস্তব পরিস্থিতি। এর পশ্চাতে ~~ব~~ একাধিক উপাদান সক্রিয় থাকে এবং তা সমাজভেদে স্বতন্ত্র হয়। ফলে এই বিলম্বনের গতিবিধি স্বতন্ত্র রূপ লাভ করে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক অগবার্ন (W.F. Ogburn) বলেন যে,—

> সংস্কৃতি সর্বদা এবং সর্বত্র একতালে পা ফেলে চলতে পারেনা। কোন কোন ক্ষেত্রে এগিয়ে যায়, আবার কোথাও বা তা পিছিয়ে পড়ে। কিন্তু সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারা অত্যন্ত ধীরগতিসম্পন্ন।

সংস্কৃতির এই উপাদান গুলি যদি পরিবর্তিত হয়ও, তবে তার পশ্চাতে থাকে দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টা। তাই সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে সমাজের অন্যান্য পরিবর্তনের সাথে একটা ব্যবধান রচিত হয়।

▨ সংস্কৃতির স্থায়িত্ব॥

সমাজে সংস্কৃতিগুলির বিলম্বন বা ব্যবধান যত দীর্ঘ হতে থাকে এবং তা যত বেশি স্থায়িত্ব লাভ করে, সমাজে ততই নানা বিধ সমস্যা দানা বাঁধতে থাকে। এই বিলম্বনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে যে পরিস্থিতি গড়ে উঠে, তাকে "অগবার্ন" সাংস্কৃতিক বিলম্ব হিসাবে চিহ্নিত করেন। এর দ্বারা সাংস্কৃতিক অগ্রগতির বাস্তবিক অনুপুঙ্খ অবস্থান অনুভূত হয়। অর্থাৎ এর দ্বারা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের গতিবিধি নির্ণীত হয়।

▨ অসম মূল্যবোধ॥

সাংস্কৃতিক বিলম্বনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সমাজে অবস্থিত অসম মূল্যবোধ। সমাজে ব্যক্তির নীতিবোধ সকলের মধ্যে সমানভাবে অবস্থান করে না। এর ফলে কেউ বৃহত্তর সমাজের মঙ্গলার্থে আত্মনিবেদনে উৎসাহী হন। সমাজের অভ্যন্তরে এই নীতিবোধের অবস্থান করে, তার ফলে সমাজের বিভিন্ন অংশ এর দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়। মানুষে মানুষে ব্যবধান এর দ্বারা বাড়ে; কমেনা কখনো।

▨ প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি॥

প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ফলেও সাংস্কৃতিক বিলম্বন দীর্ঘতর হয়ে থাকে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের বহুমুখী জীবন ধারনের স্পৃহা বৃদ্ধি পাচ্ছে, নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে উৎপাদনগত বৈচিত্র্য, উৎপাদন প্রক্রিয়া ইত্যাদি পরিবর্তিত আকার লাভ করেছে। বহুমুখী শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীগুলির স্বরূপ সাধারনের মধ্যে উন্মোচিত হচ্ছে সহজ ভাবে, কিন্তু এই সকল পরিবর্তিত সুযোগ সুবিধা গুলিতে একটা মুষ্টিমেয় শ্রেনী অংশগ্রহন করতে পারছে। কেননা এখানে মানুষের সামর্থ্যের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ন। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে বিকশিত প্রযুক্তিগত এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহায়-সম্বলগুলির অনুপ্রবেশ না ঘটার ফলে সমাজে সাংস্কৃতিক বিলম্বন দীর্ঘতর হচ্ছে।

সাধারন ভাবে মানুষ পুরানো ধারনা গোঁড়ামি এবং প্রথাকে শ্রদ্ধা করে। পূর্ব পুরুষের পদাঙ্ক অনুসরন করতে তারা আগ্রহী কারন এটি সহজ। কোন ক্ষেত্রে (যেমন কৃষি) নতুন

শিল্প বিপ্লবকে আর্বারন ভেবলেন স্বাগত জানায় না কারণ এতে পাপ বলে মনে করা হয়।

Cultural lag of Criticism (সমালোচনা)

বহু সমাজতাত্ত্বিক "অগবার্ন" এর সাংস্কৃতিক বিলম্বনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতি শুধু বিরূপ মতামত প্রদর্শনই করেন নি, অত্যন্ত কড়া ভাষায় সমালোচনাও ~~করে~~ কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন।

① অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ এরূপ মনে করেন যে সাংস্কৃতিক বিলম্বন / ব্যবধান~~কে~~ কোন কার পরে থাকবে সে বিষয়ে কোন সঠিক মানদণ্ড রচিত ~~হয়নি~~ হয়নি।

② বস্তুগত ও বস্তুহীন সংস্কৃতির সুস্পষ্ট পৃথকীকরণ অগবার্ন এর তত্ত্বে পরিলক্ষিত হয়নি। তাছাড়া বস্তুহীন সংস্কৃতি গুলি সর্বদা বস্তুগত সংস্কৃতির তুলনায় পিছিয়ে পড়বে — এই বিষয়টি এইভাবে ভাবার তেমন প্রয়োজন আছে বলেও মনে হয়না।

③ অনেকে "lag" কথাটি নিন্দাসূচক বলে মনে করেন। কাজেই এখানে পশ্চাদবর্তিতা কথাটি যথাযথ বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

④ এখানে যে প্রযুক্তিগত ব্যবধানের কথা বলা হয়েছে, তা কেবলমাত্র প্রযুক্তিগত কারনেই গড়ে উঠতে পারে তা নয়, অন্যান্য কারনও এর পশ্চাতে কাজ করতে পারে।

⑤ সাংস্কৃতিক ব্যবধান কোন কোন ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক সংঘাতেও পরিবর্তিত হতে পারে।

⑥ "অগবার্ন" তত্ত্বের আর একটি গুরুত্বপূর্ন ত্রুটি গুলি হল, সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত যে কোন ~~[illegible]~~ অসমতাই সাংস্কৃতিক বিলম্বন হিসাবে চিহ্নিত হয়, "ম্যাকাইভার" মনে করেন, প্রযুক্তিগত বিলম্বন, প্রযুক্তিগত অবরুদ্ধতা, সাংস্কৃতিক সংঘাত প্রভৃতি নামকরণও এখানে করা যেতে পারে।

তবুও একথা বলা যায় যে, সমাজতত্ত্বের সাংস্কৃতিক বিলম্বনের একটা গুরুত্ব আছে। এর দ্বারা সমাজে সাংস্কৃতিক অবিচ্ছিন্ন পরিচ্ছন্ন রূপ লাভ করে, তাছাড়া এর দ্বারা মানুষের আচরন গত বৈশিষ্ট্য গুলি উন্মুক্ত হয়। পারস্পরিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রন ও বিকাশ সম্ভব হয়। তাই অভ্যন্তরীন কিছু ত্রুটি বিচ্যুতিকে কাটিয়ে উঠতে পারলে তা সমাজের ক্ষেত্রে বিশেষ ফলদায়ী হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করা হয়।

Q. What is cultural unity and diversity in Indian. (ভারত বর্ষের সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং বৈচিত্র)

Ans: ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এর বৈচিত্র। বিভিন্ন দিকের বৈচিত্র ছড়িয়ে আছে যেমন- প্রাকৃতিক পরিবেশ, জাতি, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদি। ভৌগোলিক বৈচিত্র

ভৌগোলিক বৈচিত্র নিয়ে ভারত বর্ষ একটি বিশাল দেশ। সুউচ্চ পর্বত মালা, সমভূমি, বৃহৎ মরুভূমি, অত্যাধিক উষ্ণ, শীতল ও বৃষ্টিপাত অঞ্চল, বনাঞ্চল, সাগর, নদী, সবই ভারতবর্ষে আছে। এই প্রাকৃতিক বৈচিত্র সত্ত্বেও ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক ঐক্য রক্ষায় ভূগোলের অবদান কম নয়। উত্তরের হিমালয়কে দেবদেবীর বাসভূমি বলে মনে করা হয়, সত্য অন্বেষনের জন্য অনেক মুনিঋষি গন এই স্থানে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী প্রমুখ নদী সমূহকে অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করা হয়। ভারতীয়দের মধ্যে যে বৈচিত্র তার মধ্যে ঐক্য সৃষ্টিতে এই নদী ও পর্বত মালার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ভারতীয়দের বৈচিত্রের আর একটি দিক হল ধর্ম। হিন্দু, মুসলিম, জৈন, শিখ প্রভৃতি সব ধর্মের লোকেরা ভারতবর্ষের অধিবাসী, বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন সংস্কৃতি আছে আবার একই ধর্মের মধ্যে ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র দেখা যায়। কিন্তু সব ধর্মাবলম্বীর মধ্যেই আমরা ভারতবাসী এই মনোভাব দেখা যায়। প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব উৎসব আছে। এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন — একই ধর্মের লোক সমবেত হয় তেমনি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা ও সমবেত হয়। এর ফলে বিকশিত হয় সমন্বিত সংস্কৃতি। এই সমন্বিত সংস্কৃতিকে আরও শক্তিশালি করে তুলতে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ধর্মের মধ্যে তুলনা মূলক আলোচনা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বৈচিত্রের অন্যতম দিক হল ভাষাগত বৈচিত্র ভারতবর্ষে আঞ্চলিক ভাষার সংখ্যা 14টি, আর চারটি ভাষাগত পরিবারের উপভাষার সংখ্যা 227 টি। এই কারনেই বিদেশিরা মনেকরেন ভারত এক নয় ভাষাগত বৈচিত্রের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ সমগ্র ইউরোপের ন্যায় এবং পোশাক পরিচ্ছেদ খাদ্য এবং সাধারন জীবন যাত্রার মধ্যে পার্থক্য তার থেকেও অধিক।

তা সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক চেতনা নৈতিকতা, এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ভারতীয় ঐক্যকে সুদৃঢ় করেছে যা ইউরোপের নিকট অজানা তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে একমাত্র ধর্মের ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য সবদিকে ভাষায় বাঁধা ভারতীদের মধ্যে পারস্পারিক বিচ্ছিন্নতার কারন হয়ে উঠেছে। এই ভাষাগত পার্থক্যকে নন্যতম পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য বিভিন্ন কমিশন বিশেষ সুপারিশ করেছেন।

বৈচিত্রের আর একটি উৎস হল বিশেষ সম্প্রদায় গত সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ কোন অঞ্চলের অধিবাসী এবং যাদের মধ্যে জৈব সম্পর্ক আছে তাদেরকে নিয়েই এক সময় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। অঞ্চলের জনগনের মধ্যে ধর্ম, ভাষা, এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে পারস্পারিক সহযোগিতা দেখা যায়। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা পরিবেশগত উপাদান ইত্যাদি কারনে বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে একটা আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দীর্ঘ এবং সমষ্টিগত সংস্কৃতি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও পরস্পর আক্রমনাত্মক হয়ে ওঠেনি। মুসলিম ও ব্রিটিশ শাসকগন ও নিজেদের সংস্কৃতি অপর ধর্মের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়নি খুব অল্প ক্ষেত্রেই তার জোর করেছিলো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক স্বাধীনতাকে তারা খর্ব করেনি। জাতীয় আন্দোলনের সময় আমরা একই চিত্র দেখতে পাই। ভারতবর্ষের ঐক্য ও সংহতি রাখার জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় ভাষাভাষি এবং আঞ্চলিক সেন্টিমেন্টের প্রতি আহবান জানানো হয়েছিল। ব্রিটিশদের প্রাধান্যকে প্রতিহত করার জন্য সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য দেখা দিয়েছিল। হিন্দু, মুসলিম, এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্রিটিশদের বিরোধিতা করেছে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে জাতীয়। জাতীয় আন্দোলন বিভিন্ন ~~সম্প্র~~ সম্প্রদায় এবং সংস্কৃতিকে এক করে দিয়েছিলো যদিও শেষের দিকে উভয়ের মধ্যে সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের দেওয়াল মাথা তুলে দাঁড়ায় যার ফলে দেশভাগ হয়। আধুনিক শিক্ষা যাতায়াত এবং যোগাযোগের সুবন্দোবস্ত শিল্পায়ন এবং নগরায়ন ঐক্যের নতুন ভিত্তি হিসাবে দেখা দিয়েছে।

—০—

Q. লোকাচার কাকে বলে? (Folkways) ও বৈশিষ্ট্য (Characteristics)

1906 সালে অধ্যাপক উইলিয়াম গ্রাহাম সামনার তাঁর Folkways নামক জনপ্রিয় গ্রন্থে সর্বপ্রথম "লোকাচার" কথাটি উল্লেখ করেন। এই গ্রন্থে লোকাচার সম্পর্কে বলেন যে—

> সমাজের অনুমোদিত আচারনাবিধি হল লোকাচার।

— এর আবির্ভাব এবং আবর্তন প্রক্রিয়া প্রকৃতিকেন্দ্রিক, স্বাভাবিক, অকৃত্রিম। এগুলির অবস্থানে থাকে মানুষের সমাজে বদ্ধ অভিজ্ঞতা, দৈনন্দিন প্রয়োজন ~~ভিত্তিক~~ মূলক স্বার্থ, ঐতিহ্য প্রভৃতি। * অধ্যাপক ম্যাকাইভার পেজের মতে —

> সমাজের অনুমোদিত এবং স্বীকৃত আচরন হল লোকাচার।

— এর পশ্চাতে থাকে শিষ্টাচার, আচরনের স্বীকৃত রীতিনীতি, মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনভিত্তিক ব্যবহারিক জ্ঞান-ধারনা, আহার-বিহার, চাল-চলন প্রভৃতি। * অধ্যাপক গিসবার্ট (P. Gisbert) এর মতে—

> লোকাচার হল স্বতঃস্ফূর্ত মানবীয় আচরন, তবে এগুলি মনন-শীলতার দ্বারা উদ্ভূত নয়।

— আবার অধ্যাপক নিমকফ ~~Ogburn~~ এবং অগবার্ন (W.F. Ogburn and M.F. Nimkoff) এর মতে —

> আদিম সমাজে অবস্থিত কতকগুলি প্রথা হল লোকাচার।

— সুতরাং লোকাচার হল এমন কিছু স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জাগরিত স্বীকৃত সামাজিক আচরনবিধি যেগুলি পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত আকার লাভ করে সমাজের সঙ্গে সহাবস্থান করে জনজীবনের সঙ্গে মিলেমিশে থেকে সাদৃশ্যের প্রবাহ রচনা করে। লোকাচার দেশ-কালের প্রেক্ষাপটে স্বতন্ত্র হয়। যেমন— নমস্কার, করমর্দন, শুভেচ্ছা বিনিময়, মেয়েদের শাঁখা-সিঁদুর পরিধান প্রভৃতি।

▨ উল্লেখিত সংজ্ঞা বিশ্লেষনের মাধ্যমে লোকাচারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ পাওয়া যায় যথা—

- স্বীকৃত বা অনুমোদিত আচরন হল লোকাচার।
- লোকাচার স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবির্ভূত হয়, পরিকল্পিত দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে তা গড়ে উঠতে পারেনা।
- কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকাচার পরিবর্তিত রূপ লাভ করে।
- মানুষের সাধারন জীবনের নানাবিধ রীতিনীতি, আহার-বিহারের মধ্যে দিয়ে এটি প্রকাশিত হয়।
- স্বাভাবিক নিয়মে এবং মানুষের অজ্ঞাতসারেই লোকাচারের আবির্ভাব ঘটে।
- এগুলি হল প্রাচীন সমাজ জীবনের অপ্রধান প্রথা বিশেষ।
- জনগোষ্ঠীগত বিচারে লোকাচারের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।
- লোকাচার ক্রমশঃ অভ্যাসে পরিনত হয়, এই পরিস্থিতিতে লোকাচার প্রতিপালনে বিশেষ সচেতনতা অবলম্বনে প্রয়োজন হয় না। এগুলি আপনা থেকেই অনুষ্ঠিত হয়।

▨ লোকাচারের সামাজিক গুরুত্ব (Social Significance of Folkw

সমাজে লোকাচারের আবির্ভাব সম্পর্কিত সঠিক ধারনা লাভে সমস্যা থাকলেও একথা অনুমেয় যে, সমাজে লোকাচারের গুরুত্ব সবিশেষ উল্লেখ্য।

① লোকাচার সামাজিক শক্তি হিসেবে কাজ করে, যার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি তার আচার-আচরনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

② সমাজ জীবনকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে গড়ে তুলতে লোকাচার অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। আর সমাজকে শুধু নিয়ন্ত্রিত করেনা, শৃঙ্খলিতও করে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের এক শক্তিশালি সংগঠন হিসেবে সমাজকে গড়ে তুলতে সমর্থ হয়।

③ লোকাচার প্রচলিত সমাজের অভিভাবক হিসাবে কাজ করে। মানুষ তাই লোকাচারকে অনায়াসে মেনে নিতে পারে। এর ফলে (সমাজ ছন্দবদ্ধ হয় এবং সুসংহত রূপ লাভ করে।)

(৪) লোকাচার প্রচলিত সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনধারার সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। তাই এগুলিকে মানুষ সহজে মান্য করে।

(৫) লোকাচার প্রচলিত সমাজে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে প্রতিপালিত হয়।

(৬) সমাজের ধারাবাহিকতা রচনার ক্ষেত্রে লোকাচারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

(৭) সমাজের অনুমোদিত আচরনবিধি হল লোকাচার।

(৮) লোকাচার চিরাচরিত প্রথাভিত্তিক হলেও কালের পরিবর্তনের সাথে এগুলি পরিবর্তিত রূপ লাভে সক্ষম, ফলে পরিবর্তিত সমাজ-এগুলি যেমন সহজে গ্রহন করতে পারে, আবার সমাজের প্রবাহ ধারায় লোকাচার গুলি যথাযথভাবে অবদান করতে পারে। তাই লোকাচার বিহীন ভাবে সমাজকে কখনো অবস্থান করতেও হয়না।

(৯) বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে নগরকেন্দ্রিক সমাজে লোকাচারের ভূমিকা কিছুটা হ্রাস পেলেও গ্রামগুলি আজও লোকাচার ভিত্তিক বলে গন্য হয়।

(১০) লোকাচার গুলি গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের সঙ্গে দ্রুত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত যার ফলে এগুলি সহজেই পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে অনুসৃত ~~হয়~~ হতে পারে।

(১১) লোকাচারের বিকল্প কোন আচরন পদ্ধতি গড়ে তোলার চেষ্টা আজও কোন সমাজে লক্ষ্য করা যায়নি। লোকাচার পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে সক্ষম বলে এই বিষয়ে গোষ্ঠী গুলির সঙ্গে তা সহজে মিলেমিশে থাকতে পারে।

(১২) লোকাচারের নিজস্ব কোন স্বার্থ নেই। সমাজের স্বার্থই লোকাচারের স্বার্থ, সমাজকে শৃঙ্খলিত করতে, ধারাবাহিক করতে, সংঘবদ্ধ করতে লোকাচার প্রভৃতি ভূমিকা পালন করে।

সুতরাং, সমাজে লোকাচারের গ্রহন যোগ্যতা নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এর পশ্চাতে যেমন কোন আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া পদ্ধতি রচনার প্রয়োজন হয়না, আবার কোন প্রকার বল প্রয়োগের নীতিও গ্রহন করতে হয়না, সমাজে যেমন, উপহাস, ধিক্কার, বিদ্রূপ থাকে আবার ভাল কাজের উৎসাহ দিতে বাহবা, সহানুভূতি ইত্যাদিও থাকে। লোকাচার এগুলির মধ্যে দিয়েই বাস্তবিক রূপ লাভ করতে সক্ষম হয়। সুতরাং লোকাচারকে সামগ্রিকভাবে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা সমাজের নেই বললেই চলে।

—০—

Q. লোকনীতি কাকে বলে? (Mores)

'লোকনীতি' কথাটি ইংরেজী mores থেকে এসেছে, যার ল্যাটিন শব্দ হল Moralis, mos অথবা mores শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর অর্থ হল প্রথা (Custom)। এগুলি সমাজের অবশ্য-পালনীয় লোকাচার যা প্রথার ন্যায় কঠিন-কঠোর। এর পশ্চাতে মূল্যমানের আবশ্যিকতা থাকে। কোন লোকাচারের সঙ্গে যখন ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কিত হয় তখন তা লোকনীতি হিসাবে বিবেচিত হয়। তাই লোকনীতি হল মূল্যবোধ-যুক্ত আচার।

অধ্যাপক ম্যাকাইভার এবং পেজের মতে— লোকনীতি হল — "মানবীয় সম্পর্কের / আচরণের নিয়ন্ত্রক"। আবার উইলিয়াম গ্রাহাম সামনার (W. G. Sumner) এর মতে— লোকাচারের সাধারণ অর্থ / ধারণার সঙ্গে সমাজ কল্যাণের আদর্শ সম্পর্কিত হয়, ন্যায়-অন্যায়ের মান সংযুক্ত হয় তখন তাকে লোকনীতি বলে।

সুতরাং, লোকনীতি হল এমন কতকগুলি অবশ্য-পালনীয় লোকাচার যার পশ্চাতে থাকে মূল্যমানের (ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত) আবশ্যিকতা, যা দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র হয়, যা সার্বজনীন এবং মানবীয় আচরণের নিয়ন্ত্রক বিশেষ। যেমন— গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা, পিতা মাতাকে মান্য করা ইত্যাদি।

▨ লোকনীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য:

(১) লোকনীতি সমাজের একপ্রকার শিষ্টাচার হিসাবে গন্য হয়,
(২) লোকনীতি সমাজের বিশেষ ধরনের প্রথা যা অলঙ্ঘনীয়
(৩) লোকনীতিকে অবশ্য পালনীয় লোকাচার হিসাবে গন্য করা হয়।
(৪) এর পশ্চাতে মূল্যমানের আবশ্যিকতা থাকে। কোন লোকাচার যখন— ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় দ্বারা বিবেচিত হয় তখন তা লোকনীতি হিসাবে বিবেচিত হয়।
(৫) এটি মানবীয় আচরণের নিয়ন্ত্রক স্বরূপ,
(৬) কোন পরিকল্পিত দৃষ্টিকোন থেকে লোকনীতি জাগ্রত হয় না।
(৭) সমাজের একটি স্বাভাবিক আচরণবিধি হল লোকনীতি।
(৮) দেশ-কাল ভেদে লোকনীতি পরিবর্তিত আকার লাভ করে।
(৯) কালের প্রয়োজনে সমাজের প্রতিক্রিয়া হল লোকনীতি
(১০) এর উদ্ভব সম্পর্কীত কোন সুস্পষ্ট ইতিহাস নেই। তবে এটি একটি সার্বজনীন ধারণা বিশেষ।

লোকনীতির সামাজিক গুরুত্ব (Social Significance of Mores)

সমাজ জীবনে লোকনীতির গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজের নানা বিধি-দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে লোকনীতি বিশেষ ভূমিকার অধিকারী। যথা—

① লোকনীতি ব্যক্তিগত আচার-আচরণের অন্যতম নির্ণায়ক হিসাবে বিবেচিত হয়।

② লোকনীতি সমাজের ঐতিহ্যমূলক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

③ [সামাজিক সংহতির প্রশ্নে লোকনীতির সামাজিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।] দৈনন্দিন একই ধরনের আচার-আচরণের মাধ্যমে মানুষ পারস্পরিক সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে। অভিন্ন লোকনীতি অভিন্ন মানসিকতা গড়ে তোলে। স্বতঃস্ফূর্ত বাধ্যবাধকতা থাকায় লোকনীতি অমান্য করার কোন সুযোগ থাকে না।

④ [সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে লোকনীতির আবশ্যিক ভূমিকা থাকে।] ইহা মানুষের নীতি-অনুভূতি, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়-বোধ জাগ্রত করতে সহায়তা করে। ব্যক্তিগত আচার আচরণের প্রতি লোকনীতি অত্যন্ত সজাগ থাকায় এর উপর ব্যক্তির আচরণ বিধি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে।

⑤ [যেখানে শিষ্টাচারের প্রশ্ন জেগে ওঠে, লোকনীতি সেইখানে সেখানেই আবির্ভূত হয়।] শিষ্টাচার সমাজকে শৃঙ্খলিত করে, সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলে এবং ঐতিহ্যনির্ভর করে। ফলে সমাজের ধারাবাহিকতা সহজতর হয়।

⑥ লোকনীতি কোনপ্রকার পরিকল্পিত চিন্তাভাবনা থেকে অবস্থান করে না। এর চলন অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাই লোকনীতিগুলি মান্য করার জন্য সমাজে কোন স্বতন্ত্র কাঠামো গড়ে তুলতে হয়না। এটি সমাজের একটি স্বাভাবিক আচরণবিধি হিসাবেই গন্য হয়।

⑦ [সমাজের সমান্তরালে লোকনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, আবর্তিত হয়।] কোন সমাজে একই ধরনের লোকনীতি থাকেও না। আবার কালের স্রোতের সঙ্গে লোকনীতি বিবর্তিত হয়। ফলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এসে লোকনীতিকে বাতিল বলে ঘোষনা করতে হয়না। পরিবর্তিত সমাজের উপর দাঁড়িয়ে লোকনীতি তার পরিবর্তিত কাঠামো গড়ে তোলে, সমাজকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করতে পারে।

⑧ [লোকনীতির মাধ্যমে মানুষের গোষ্ঠীগত আচরণের পরিচয় পাওয়া যায়।] সকলের প্রচেষ্টায় লোকনীতি মান্য করার মধ্য দিয়ে গোষ্ঠীর সঙ্গে সমাজের একাত্মবোধ সহজেই রচিত হতে পারে।

(ঙ) লোকনীতি মান্য করার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, গোষ্ঠীর সঙ্গে সমাজের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হতে থাকে। তাই বলা যায় প্রচলিত লোকনীতি গুলি সমষ্টিবদ্ধ সমাজজীবনের পরিচয় বহন করে।

সাম্প্রতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে প্রভাবিত বহুমুখী সমাজব্যবস্থায় লোকনীতি গুলি ক্রমপরিবর্তিত আকার লাভ করেছে। ফলে একসময় প্রতাপশালী লোকনীতি বর্তমানে অনেকটাই গৌন আকার লাভ করেছে। কিন্তু পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সমাজ লোকনীতি গুলি মুছে দিতে পারেনি। আজও এই সমাজ গুরুজনদের শ্রদ্ধা করে; ~~স~~ সন্তান তার পিতা মাতাকে ভক্তি করে। আজও ~~এই সমাজ~~ এগুলি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সমাজে লোকনীতিশূন্য হয়েছে একথা বলা যায় না।

★ লোকাচার ও লোকনীতির মধ্যে সাদৃশ্য কি? (Similarities)

লোকাচার ও লোকনীতি দুটি প্রচলিত সমাজের ক্ষেত্রে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পারস্পরিক সহবস্থানকারী ধারনা, তা অস্বীকার করা যায় না। এগুলি পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেনা। এদিক থেকে উভয়ের মধ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

(১) লোকাচার এবং লোকনীতি সমাজের স্বীকৃত আচরনবিধি হিসাবে চিহ্নিত হয়।

(২) উভয়ের অবস্থান সার্বজনীন।

(৩) উভয় ক্ষেত্রেই উদ্ভবকাল অজ্ঞাত।

(৪) লোকাচার ও লোকনীতি পারস্পরিক সহায়ক ~~বিধি বিধি~~ বিধিবিধান।

(৫) উভয়েই পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেনা।

(৬) উভয়েই অত্যন্ত স্বাভাবিক, এখানে কোন প্রকার কৃত্রিমতার স্থান নেই।

(৭) লোকাচার ও লোকনীতির পিছনে কোন স্বার্থসাধনের দৃষ্টিভঙ্গী নেই।

(৮) উভয়েই সার্বজনীন, তবে কালভেদে এগুলির অবস্থান স্বতন্ত্র হয়।

(৯) উভয়েই সমাজের ঐক্য বিধান, ধারাবাহিকতা এবং ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

(১০) উভয়েই চলন স্বাভাবিক এবং চাহিদাবিহীন, তাই এগুলি মানুষ অতি সহজেই মেনে নিতে পারে।

(১১) লোকাচার ও লোকনীতি প্রকৃতিমুখী এবং পরিবর্তনশীল উভয়েই কাঠামো বিহীন।

(১২) সমাজ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে উভয়ের উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লোকাচার ও লোকনীতির পার্থক্য
(Differente between Folkways and Mores)

লোকাচার এবং লোকনীতির মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া গেলেও উভয়ের মধ্যে মৌলিক ক্ষেত্র কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

(১) লোকনীতি হল অবশ্য পালনীয় লোকাচার, কেননা লোকনীতি প্রতিপালনে থাকে কতকগুলি বাধ্যবাধকতা, কিন্তু লোকাচার প্রতিপালনে এই বাধ্যবাধকতা থাকে না।

(২) লোকনীতির সঙ্গে থাকে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন, সমাজকল্যাণের দাবী, কিন্তু লোকাচারে এগুলি অনুপস্থিত থাকে।

(৩) লোকনীতির তুলনায় লোকাচার ব্যাপক।

(৪) লোকনীতিগুলি সমাজে প্রচলিত প্রথাগুলির মত অবশ্য পালনীয় হয়। কিন্তু লোকাচার প্রতিপালনে এই বাধ্যবাধকতা থাকে না।

(৫) সমাজে গুরুত্বের বিচারে লোকাচারের তুলনায় লোকনীতি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

(৬) সমাজ জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোকনীতি এত গভীর ভাবে সম্পৃক্ত থাকে, যার ফলে লোকাচারের তুলনায় লোকনীতি অধিকতর স্থায়ী হয়।

(৭) লোকনীতি লঙ্ঘন করলে সমাজের ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু লোকাচার লঙ্ঘন করলে এরূপ আশঙ্কা দেখা দেয় না, এদিক থেকে লোকনীতির গুরুত্ব লোকাচারের তুলনায় অধিক।

(৮) অতীত সমাজে প্রচলিত বহু লোকনীতি তার গুরুত্ব হারিয়ে লোকাচারে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু লোকাচার গুলি গুরুত্ব হারিয়ে বিলীন হয়ে গেছে।

সবশেষে বলা যায় লোকাচার ও লোকনীতির মধ্যে ~~আ~~ আপাত পার্থক্য লক্ষ্য করা গেলেও বাস্তবিক অর্থে উভয়ের উপস্থিতি পরিপূরক স্বরূপ। একটির ভিন্ন অপরটির চলন দুর্বল হয়ে পড়ে। সমাজের সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতা, ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, শৃঙ্খলা এবং পারস্পরিক আচার-আচরণের নিয়ন্ত্রক স্বরূপ লোকাচার এবং লোকনীতির পারস্পরিক সম্বন্ধ বিঘ্নিত ~~হয়~~ হলে সমাজের স্বাভাবিক চলন বিঘ্নিত হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

— ০ —

জাতীয় সংহতি (National Integration)

জাতীয় সংহতি কী? (What is National Integration ?)

জাতীয় সংহতি মূলত একটি ভাবাদর্শ। এই সংহতি আসে ভৌগোলিক সাযুজ্য, এক ভা এক কৃষ্টি, এক ধর্ম, একই আদর্শে বিশ্বাস থেকে—এই সংযোগ রক্ষাকারী, এক ব একাধিক অবস্থা থেকে জাতীয় সংহতি আসে। ভৌগোলিক সীমা ও উপজাতির আনুগত্যকে অস্বীকার করে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি জাগরিত হওয়াকে জাতীয় সংহতি বা National integration বলা যায়। "Intergration means bringing about economic, social and cultural differences (prevailing among people) within tolerate range. It consists in saving people from sectional prejudices and prepossessions and creates and strengthens in them attributes of patriotism and national pride."

জাতীয় সংহতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা (Need for National Integration)

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন—"In India the first essential is the maintenance of the unity of the country, not merely a political unity but a unity of mind and heart. National integration and cohesion is a matter of vital importance today. It is the base of all other activities" অর্থাৎ ভারতের ঐক্য বজায় রাখাই হল প্রধান কাজ। এই ঐক্য শুধু রাজনৈতিক ঐক্য নয়, এটি মন ও হৃদয়ের ঐক্য। বর্তমানে জাতীয় সংহতি একান্তই প্রয়োজন কারণ অন্যসব কাজের এটিই ভিত্তিভূমি।

এই বক্তব্যের মধ্য দিয়েই পণ্ডিত নেহরু জাতীয় সংহতির সর্বাধিক প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন।

জাতীয় সংহতি শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়। স্বাধীনতা লাভের পর সাংবিধানিক শর্তে আমরা রাজনৈতিক দিক থেকে যে ঐক্যের সান্নিধ্যে এসেছি, সেই ঐক্যই যথেষ্ট নয়। মন ও হৃদয়ের ঐক্য অর্থাৎ বৌদ্ধিক ও প্রাক্ষোভিক সংহতিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বুদ্ধি বা আবেগের ঐক্য জাতীয় সংহতির পথে ধর্মীয়, আঞ্চলিক বা যে-কোনো প্রকার বাধাবিপত্তির অবসান ঘটাতে পারে।

অসংযত ভাবাবেগ ও নির্বিচার সংস্কারের দ্বারা চালিত হওয়া উচিত নয়, বিচারবোধ ও সংযত আচরণ জাতীয় সংহতির পক্ষে কল্যাণকর।

জাতীয় ঐক্য ও সংহতির ওপর দেশ তথা জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন নির্ভর করে।

বর্তমান পরিস্থিতি (Present Situation)

ধর্ম, ভাষা ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্রের উর্ধ্বে উঠে একসময় ভারতের জাতীয় সংহতি রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি বেশ উদ্‌বেগজনক। ব্রিটিশ ভারতে যে ভাবধারা

ভারতীয় সমাজকে ঐক্য ও অখণ্ড চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করেছিল, সেই ভাবধারা আজ প্রায় পরিত্যক্ত। জাতির সামনে এমন কোনো কর্মসূচি নেই যা জনসাধারণের মনে জাতীয়তাবোধের জন্ম দিতে পারে। তাই ভারতের বিশাল জনসমষ্টির অসন্তোষ বিক্ষোভ, ধর্মঘট , শ্রমিক-মালিক সংঘাত, দুর্নীতি, সমাজদ্রোহী কার্যকলাপ, জাতীয় সম্পত্তির ক্ষতি ইত্যাদি চরমরূপে আত্মপ্রকাশ করছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যত শিথিল হবে, মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ তত দুর্বল হবে—এটিই স্বাভাবিক।

রাজ্যে রাজ্যে অনৈক্য, হিংসা-দ্বেষ, অর্থনৈতিক বৈষম্য কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের তিক্ততা, শ্রেণি সম্প্রদায় ও আঞ্চলিক সংকীর্ণতা ভারতীয় সমাজকে জীর্ণ করে তুলেছে। সমাজের প্রতি পর্বের অবক্ষয় জাতিকে গ্রাস করছে।

আধুনিক ভারতে ভাষাগত পার্থক্য, প্রাদেশিকতা, মৌলবাদ ইত্যাদি বিচ্ছিন্নতাবাদী অশুভ শক্তিগুলি ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠছে। জম্মু-কাশ্মীর, বোরোল্যান্ড, গোর্খাল্যান্ড, নাগাল্যান্ড, তেলেঙ্গানা—এই সব জায়গাতেই পৃথক রাষ্ট্রগঠনের দাবি এক মারাত্মক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

জাতীয় সংহতির প্রশ্নটি আজ অত্যন্ত জরুরি। তাই সকলকে ঠান্ডা মাথায় সমস্যাটি বুঝতে হবে এবং চিন্তা করতে হবে। সমস্যা সমাধানের জন্য ভাবতে হবে—কীভাবে অবিচার, অন্যায়, অসাম্যকে দূর করা যায়। ভারতীয় নাগরিকত্বের অবমাননা না করে বিভেদকামী শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রিক সংহতি আনার প্রচেষ্টা চলছে। সুতরাং জাতীয় সংহতিকে উপেক্ষা করা যায় না। রাষ্ট্রের মধ্যে প্রাথমিক সংহতি স্বাভাবিক নিয়মে অগ্রসর হবে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংহতির দিকে।

বর্তমান ভারতের এই পরিস্থিতিতে নানা কারণে জাতীয় সংহতির একান্ত প্রয়োজন—

বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এবং দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য জাতীয় সংহতির বিশেষ প্রয়োজন।

আমাদের দেশে বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য, জাতি ও ভাষাগত পার্থক্য, রীতিবিধির এত বৈচিত্র্য পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে দেখা যায় না। এইসব বিভিন্নতার কারণে প্রায়শই মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দেয়। আমরা সকলে এক জাতির অন্তর্গত—এ চেতনা আমাদের মধ্যে জাগরুক থাকলে যে-কোনো সমস্যারই শান্তিপূর্ণ সমাধান করা সম্ভব।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাতীয় সংহতি থাকা একান্ত আবশ্যক। গণতান্ত্রিক আদর্শকে সফল করে তুলতে হলে মানুষে মানুষে ঐক্য গড়ে তোলা অতীব দরকার। রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক হানাহানির ফলে জীবনহানি ও জাতীয় সম্পত্তি নষ্ট হয়। তাই ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশকে সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তুলতে হলে জাতীয় সংহতি অপরিহার্য।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সর্বদা সৌহার্দপূর্ণ থাকছে না। ভারত ও চিনের সীমানাবিরোধ মেটেনি, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ অব্যাহত। বাংলাদেশের সঙ্গে তিস্তাচুক্তি আজও সম্পাদিত হয়নি। কাশ্মীর পরিস্থিতির জন্য, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করা হচ্ছে। জাতীয় চেতনার অভাবে আজও এদেশের কিছু মানুষের বিদেশের প্রতি আনুগত্য খুব বেশি। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় সংহতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

বহু মত ও বহু পথের মধ্যে সার্থক সংহতি বিধান ভারতীয় জনজীবনের চিরকালীন ঐতিহ্য। তথাপি ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে দেখা দিয়েছে অনেক দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা, দুর্বলতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সবক্ষেত্রে চরম বৈষম্য—যার ফলে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যাহত হচ্ছে। বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে সামগ্রিক অগ্রগতি, অশান্তির কালো মেঘ মাঝে মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। এই অবস্থার প্রতিকার প্রসঙ্গে কোঠারি কমিশনে বলা হয়েছে—সামাজিক ও জাতীয় সংহতি ফিরিয়ে আনার জন্যে শিক্ষার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। Even more important is the role of education in achieving social and national integration—Kothari Commission Report (1964-66).

প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষাই ব্যক্তি ও সমাজজীবনের পূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে পারে। এর জন্য প্রথম প্রয়োজন স্থানীয় ও আঞ্চলিক স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে স্বীকার করে নেওয়া। বৈচিত্র্য আছে, বৈচিত্র্য থাকবেই, বৈচিত্র্যের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ করে দিলেই ভারতের জাতীয় জীবনে ভাবগত উপাদানগুলি বিকশিত হয়ে উঠবে। কেবলমাত্র ভাবগত উপাদানই এদেশের মানুষকে সর্বভারতীয় ঐক্যবোধে সচেতন করে তুলতে সক্ষম। এই পথেই আসবে জাতীয় সমন্বয় ও সংহতি। এক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের জাতীয় সংহতি (National Integration of India)

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে অনন্য ভূখণ্ড ভারত। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য (Unity in diversity) ভারতের ঐতিহ্য। ভারতের জাতীয় সংহতির কেন্দ্রবিন্দু হল তার আত্মিক চেতনায়। এই চেতনা জন্ম দেয় এক উদার মনোভাবের 'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।'

ঐক্যবোধ, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, প্রকৃত দেশাত্মবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, সমমনস্কতা—জাতীয় সংহতির মূল উপাদান।

বিভিন্ন ভাষা, ভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষ এক ছত্রছায়ায় মিলিত হয়েছে ভারতে, কিন্তু প্রত্যেকেই তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখতে পেরেছে। বাহ্যিক বৈষম্যের মধ্যে ভাবগত ঐক্য লালিত হয়েছে। এই ভাবগত ঐক্যই ভারতের জাতীয় সংহতি। হুমায়ুন কবীর লিখেছেন—"there has always been a remarkable diversity of thought action or outlook among the Indian people, but this diversity has been organized within a generally recognizable Indian pattern".

জাতীয় সংহতি বিনাশের কারণাবলি (Causes of National Disintegration)

বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও বৈচিত্র্যের দেশ এই ভারতে জাতীয় সংহতিকে বিনস্ট করার শক্তিগুলি যথেষ্ট সক্রিয়। ধর্ম-ভাষা-জাতিগত পার্থক্য এবং আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার তাগিদ থেকে উদ্ভুত অশুভ শক্তি ভারতের জাতীয় সংহতিকে বারবার আঘাত করছে। সংকীর্ণ স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলি অশুভশক্তির রাজনীতিকরণ করছে। রক্তক্ষয়ী সংঘাতে জাতীয় সম্পত্তি ধ্বংস হচ্ছে আর মৃত্যু হচ্ছে মানুষের। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষকে উসকে দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করছে। এইসকল কারণগুলি বিশ্লেষণ করে জাতীয় অংসহিতর মূল প্রবণতাগুলি স্পস্ট করার যায়। প্রবণতাগুলি নিম্নরূপ ঃ

1. ধর্ম ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা (Religion and Religious Communalism): ভারতবর্ষে বহু ধর্মের মানুষ বাস করে—India is a multi-religious country. স্বাভাবিকভাবেই এক ধর্মের সংস্কারের সঙ্গে অন্য ধর্মের সংস্কারের সংঘাত হয়। এই সংঘাত কখনও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে ভারতবর্ষকে ভাগ করার প্রয়োজনীয়তার মূলে এই মনোভাবকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সাধারণ মানুষের ধর্মীয় আবেগ ও বিশ্বাসকে সর্বদাই কাজে লাগিয়েছে রাজনৈতিক কারবারিরা। উল্লেখযোগ্য যে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক লাভের জন্য ও দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য রাজনীতিবিদ্‌রা সর্বদাই এই জঘন্য কাজে লিপ্ত থাকে। এরা ধর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্যকে প্রশ্রয় দিয়ে মানুষের মনে সংকীর্ণ মনোভাবের সৃষ্টি করে। ধর্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণে গঠিত এই অশুভ আঁতাত ভারতের জাতীয় সংহতিকে বিনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে।

2. জাতপাতের বিভেদ (Casteism): হিন্দুধর্মের বর্ণভেদ প্রথা জাতীয় সংহতি বিনাশের অন্যতম কারণ। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় জাতিভেদ প্রথা মানুষকে শুধু জাতিতে ভাগ করেনি—সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিভক্ত করে দিয়েছে। এর ফলে উচ্চবর্ণের মানুষ সমাজের সকল অধিকার ভোগ করার সুবাদে উচ্চতম স্থানে অবস্থান করে, আর, নিম্নবর্ণের মানুষ সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্রমাগত নিম্নস্তরে পৌঁছোতে বাধ্য হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের প্রাক্‌কালে নিম্নবর্গকে কাছে টানার জন্য উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেয়। জাতপাতের রাজনীতির মাধ্যমে জাতিভেদকে উস্‌কে দেয় কিন্তু তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করে না। এর ফলে সমাজে এক অস্থিরতার সৃষ্টি হয় যা জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করে।

3. ভাষাগত সমস্যা (Language Problem): ভারতবর্ষ বহু ভাষাভাষীর দেশ। অসংখ্য ভাষার মধ্যে মাত্র কয়েকটি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যেসব ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে এবং যেসব ভাষা স্বীকৃতি পায় নি, এ দু-ধরনের জনগণের মধ্যে একটা বিদ্বেষের মনোভাব গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া স্বাধীন ভারতে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ভারতের অহিন্দিভাষী জনসাধারণ একে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি।

তাই ভাষাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রদেশে সংঘাত আজও সংগঠিত হচ্ছে। ভাষাগত সংঘাত তীব্র হয়ে উঠলে জাতীয় সংহতি বিপন্ন হয়ে পড়বে।

4. প্রাদেশিকতা (Provincialism): ভারতে জাতীয় সংহতির অন্যতম শত্রু হল প্রাদেশিকতা বা Provincialism। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যে শুধু সীমানা নিয়েই সংঘাত হচ্ছে তাই নয়, শিল্প উদ্যোগের স্থান, নদীর জল বণ্টন ইত্যাদি নিয়েও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিরোধ দেখা দিচ্ছে। কাবেরী নদীর জল নিয়ে তামিলনাড়ু এবং মহীশূরের মধ্যে বিরোধ চলছেই। সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা ও সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাবাদী স্লোগান—বিহার বিহারীদের জন্য, ওড়িশা ওড়িয়াদের জন্য, মহারাষ্ট্র মহারাষ্ট্রীয়ানদের, অসম অসমীয়াদের জন্য ইত্যাদি জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক। এই ধরনের মনোভাব পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ করে দিয়ে জাতীয় জীবনে বিভেদ সৃষ্টি করে।

5. রাজনৈতিক বিরোধ (Political Differences): ভারতের গণতন্ত্র বহুদলীয় রাজনৈতিক মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিয়ত রক্তক্ষয়ী সংঘাত শান্তিপ্রিয় মানুষদের বিচলিত করে তুলছে। আঞ্চলিক ও ধর্মভিত্তিক দলগুলি অস্থিরতা এবং সমস্যা সৃষ্টি করছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলীয় সংঘর্ষ জাতীয় সংহতিকে বিপদগ্রস্ত করে তুলছে।

6. অর্থনৈতিক বৈষম্য (Economic Disparity): ধনবণ্টনের বৈষম্য জনিত কারণে শ্রেণিবৈষম্য প্রকট হয়। বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই বিরোধ দেখা দেয়। তা ছাড়া আমাদের দেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপরেখা বিচার করলে দেখা যায়—দেশের কোনো কোনো অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য সর্বদা অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অন্য অনেক অঞ্চলকে বারবার উপেক্ষা করা হয়েছে। রাষ্ট্রের দিক থেকে এই ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ জাতীয় সংহতি স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করেছে। স্বাধীনতার এতদিন পরেও ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অর্থনৈতিক বৈষম্যমূলক অসংগতি জাতীয় সংহতির বিশেষ পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

7. জনগণের অশিক্ষা (Mass illiteracy): ভারতের বেশির ভাগ মানুষের শিক্ষার অভাব, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার জাতীয় সংহতির পথে বিরাট অন্তরায়। দেশের প্রায় 53% মানুষ শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। অশিক্ষা কুশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের যে দুস্তর ব্যবধান—তা সামাজিক বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করছে। শিক্ষার প্রসার ও বিস্তারের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবে জাতীয় সংহতি গড়ে উঠছে না।

8. জাতীয় শিক্ষালাভের অভাব (Absence of National System of Education): স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই ভারতে শিক্ষা নিয়ে বহু পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়নি। সকলের জন্য শিক্ষার সমসুযোগের কথা বলা হয়, কিন্তু ব্যবস্থা করা যায়নি। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রকৃত জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যবস্থায় ধনীব্যক্তিরাই তাদের

সন্তানদের জন্য ভালো ও উন্নতমানের শিক্ষা ক্রয় করতে পারে। আর অগণিত জনসাধারণ নিম্নমানের শিক্ষা পাচ্ছে অথবা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই অগণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী নীতি বিরুদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় অসংহতির (National Disintegration) মূল কারণ।

9. দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ (Corruption and nepotism): ভারতের কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরের দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ জাতীয় সংহতি রক্ষার এক বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা, রাজনৈতিক দলের স্বার্থপূরণের জন্য শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও পেশাগত ক্ষেত্র ভয়ংকরভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত। দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অসৎ রাস্তায় অযোগ্য ও অকর্মণ্য ব্যক্তি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি পেশায় প্রথম সারিতে স্থান পাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় নীতি ও আদর্শের প্রতি মানুষ আস্থা হারাচ্ছে এবং জাতীয় সংহতি তার গুরুত্ব হারাচ্ছে। বর্তমান অবস্থায় মূল্যবোধ অর্থহীন হয়ে পড়ছে। ফলে, সৎ চরিত্র গঠনের প্রতি মানুষ উদাসীন হয়ে যাচ্ছে। জাতীয়স্বার্থের স্থানে ব্যক্তিস্বার্থের প্রাধান্য জাতীয় সংহতিকে বিনষ্ট করেছে।

10. বেকারত্ব ও তরুণ প্রজন্মের হতাশা (Unemployment and Youth Frustration): বেকারত্ব আজ সমগ্র ভারতবর্ষকে গ্রাস করেছে। তাই দেশের যুবসমাজ ক্ষুব্ধ ও হতাশ—বর্তমান সমাজব্যবস্থা ও মূল্যবোধের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। তাঁদের সামনে নেই কোনো আদর্শ যা অনুসরণ করে তারা জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারে। শিক্ষা প্রসারের অনুপাতে কর্মসংস্থাপনের সুযোগ খুবই কম। শিক্ষিত যুবসমাজের অনন্ত শক্তি অবহেলিত হচ্ছে। দেশের উন্নয়নে যাদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তারাই আজকের সমাজে সবচেয়ে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে।

তা ছাড়া যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে, সেখানে আবার যোগ্য ও প্রশিক্ষিত কর্মী তৈরি করার মতো উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়নি। এইভাবে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ও যুব সমাজের হতাশা জাতীয় ঐক্যকে বিনষ্ট করছে।

শিক্ষা ও জাতীয় সংহতি (Education and National Integration)

শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় সংহতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ইত্যাদির মূলে থাকে শিক্ষার অভাবজনিত অজ্ঞতা। জাতিভেদ প্রথার মূলেও আছে উদারনৈতিক শিক্ষার অভাব। শিক্ষা এমন এক সামাজিক প্রক্রিয়া যা ব্যক্তির আচরণ ও নৈতিক মানের উন্নতি ঘটাতে পারে এবং অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। জাতীয় সংহতি স্থাপন করতে হলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক উন্নতি ঘটাতে হবে। জাতীয় সংহতি স্থাপনে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে ভারতের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী **কে এল শ্রীমালী** বলেছেন— If we are convinced that in the present state of our development, we must make a deliberate effort to develop national consciousness among our people, it is a legitimate demand that our educational system should be geared to fulfill this purpose.

স্বাধীনতার পর রাধাকৃষ্ণণ কমিশন (1948-49), মুদালিয়র কমিশন (1952-53) এবং কোঠারি কমিশন (1964-66) জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করতে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সম্পূর্ণানন্দ কমিটির (1961) প্রতিবেদনে জাতীয় সংহতি স্থাপনে শিক্ষার ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে—Education can play a vital role in strengthening emotional integration. It should broaden the outlook, foster a feeling of oneness and nationalism and a spirit of sacrifice and tolerance so that narrow group interests are submerged in the larger interests of the country. ভারতের নিরাপত্তা ও উন্নতির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন জাতীয় ও প্রাক্ষোভিক ঐক্য বা জাতীয় সংহতি। জাতীয়তাবোধ অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং জাতীয় সংহতি দৃঢ় করতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রত্যাশিত আদর্শকে সার্থক করার জন্য শিক্ষাকে সর্বজনের হিতের কাজে লাগাতে হবে। এর জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা দরকার ঃ

এক।। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ (Removal of Economic Disparities): ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বৈষম্য এক মস্ত অভিশাপ। এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে এবং বিদ্যার্থীদের স্বাধীন জীবিকা অর্জনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর পর্যন্ত সকলের জন্য শিক্ষার কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করা খুবই জরুরি। এ ছাড়া মাধ্যমিক স্তরের শেষে বিদ্যার্থীরা যাতে কিছু বৃত্তিমূলক দক্ষতা অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

দুই।। ইতিহাসের মূল্যায়ন (Evaluation of History): ইতিহাসের সঠিক মূল্যায়নের জন্য আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে ইতিহাসের ঘটনাগুলিকে বিচার করা দরকার। ইতিহাস শুধুমাত্র ঘটনার বর্ণনা নয়, কোনো দেশের ইতিহাস সেই দেশের ঐতিহ্যকে বহন করে। ভারতীয় সমাজের মূল ঐক্যের সুরটি ভারতীয় ইতিহাসে তুলে ধরতে হবে। তাহলেই ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে ধারণা গঠন করতে পারবে।

তিন।। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা (National System of Education): যে শিক্ষা জাতীয় লক্ষ্য পূরণের সহায়ক এবং ভবিষ্যতের যে-কোনো চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে জাতিকে সক্ষম করে তোলে, তাকেই জাতীয় শিক্ষা হিসাবে গণ্য করা যায়। National system of education is one which assists the nation to realise its national goals or to meet successfully the challenge that faces it from time to time—***J P Naik.***

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি আদর্শ শিক্ষানীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। 1986 সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে—বৈচিত্র্যময় ভারতে শিক্ষাকে বিশ্বজনীন হতে হবে যা সবাইকে প্রকৃত মূল্যবোধের দিশা দেবে এবং ভারতের জনগণকে সংহত করবে। মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ জাগ্রত হলে গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা, হিংসা, কুসংস্কার

—এগুলি সহজেই দূর হয়। এ ছাড়া, দেশের সর্বত্র প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা একই ধাঁচের হলে জাতীয় সংহতি দৃঢ়তর হবে।

চার।। **প্রক্ষোভমূলক সমন্বয়ন (Emotional Integration):** শিক্ষাব্যবস্থা যেমন জাতীয় ঐক্য ও চেতনা সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি তাকে স্থায়িত্ব প্রদান করতে পারে। জাতীয়তাবোধ একটি আত্মিক গুণ (Spiritual quality)—ব্যক্তিমানুষের অন্তর থেকে উৎসারিত। জাতীয়বোধের স্বতঃস্ফূর্ত মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য প্রাক্ষোভিক সমন্বয়ন অপরিহার্য, কেবলমাত্র পুঁথিসর্বস্ব বিদ্যা (bookish knowledge) এই উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না। Committee on Emotional Integration মনে করেন যে—প্রাক্ষোভিক সংহতিকে শক্ত করার জন্য শিক্ষাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই প্রসঙ্গে শুধুমাত্র জ্ঞানদান করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সার্বিক উন্নয়নও বিশেষভাবে কাম্য। শিক্ষাই শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্প্রসারিত করতে পারে। একাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ ও উদার মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে। এইভাবে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সংকীর্ণ দলীয় ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের অবলুপ্তি ঘটাতে পারে।

পরিবার থেকে প্রাক্ষোভিক সংহতিসাধন শুরু হয়। পরবর্তীকালে বিদ্যালয় ও নানান সামাজিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেশের প্রতি, জাতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সংহতিবোধ গড়ে ওঠে।

পাঁচ।। **পাঠক্রম (Curriculum):** যেসব বিষয়ে সর্বভারতীয় গুরুত্ব আছে, সেগুলিকে পাঠক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে শিক্ষার্থীর কাছে এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যে, শিক্ষার্থী যেন বিষয়গুলির মধ্যে জাতীয় সংহতির ঐতিহ্য সম্বন্ধে ধারণা লাভ করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইতিহাসের গুণাবলির গুরুত্ব বিদ্যার্থীকে বোঝাতে হবে। স্বদেশি ও জাতীয় আন্দোলনকে ইতিহাসের পাঠ্যসূচিতে স্থান দিতে হবে। এসব বিষয়ের মূল লক্ষ্য হবে জাতীয় সংহতি ও সংশ্লিষ্ট ভাবধারার সঙ্গে তাদের পরিচিত করা। মনীষীদের জীবনী, বিভিন্ন প্রদেশের রূপকথার গল্প, কাহিনি ইত্যাদিকেও পাঠক্রমে নির্বাচন করতে হবে। মাতৃভূমির ভৌগোলিক বিস্তৃতি, ও তার বৈচিত্র্য সম্পর্কে বিদ্যার্থীদের অবহিত করতে হবে। তাই মানচিত্র অনুশীলনকে (Map reading) পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

ছয়।। **ভাষা শিক্ষা (Language Learning):** ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার বিকাশের জন্য সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন ভাষার ভালো বইয়ের সঙ্গে বিদ্যার্থীগণ যাতে পরিচিত হতে পারে, তার জন্য অনুবাদের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যান্য রাজ্যের সাহিত্যের সঙ্গে মাতৃভাষার মাধ্যমে পরিচিতি জাতীয় সংহতি রক্ষায় বিশেষ সহায়ক।

কোঠারি কমিশন নির্দেশিত ত্রি-ভাষা সূত্রই অনুসরণ করতে হবে। 1986 সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে এ নীতি স্বীকৃত হয়েছে। এর মাধ্যমে যেমন আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার

ওপর গুরত্ব দেওয়া হয় তেমনি যোগাযোগের ভাষা, লাইব্রেরি-ভাষা ও আন্তর্জাতিক ভাষার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

ভাষার ব্যাকরণের সরলীকরণ (Simplification of grammar of Languages) বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার ব্যাকরণকে সহজ করতে হবে। এর ফলে বিভিন্ন ভাষাকে আয়ত্ত করা সহজ হবে। তাই UGC নিযুক্ত কমিটি বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণের সরলীকরণের পরামর্শ দিয়েছেন।

সাত।। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন (Selection of Text Books): নিজের জাতি সম্পর্কে বিদ্যার্থীদের মধ্যে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও গর্ববোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করতে হবে। জাতীয় সংহতির মানসিকতা গঠনে সহায়তা করবে—এমন পুস্তক রচনা করতে হবে। National Integration Council এ ধরনের পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য জাতীয় বোর্ড স্থাপনের কথা বলেছেন। জাতীয় পুস্তক পর্যদ (National Book Trust) জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক রচনায় ব্রতী হয়েছে। এছাড়া NCERT বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ের আদর্শ পাঠ্যপুস্তক রচনা করছে। বিভিন্ন রাজ্যে এগুলিকে আদর্শ ধরে পাঠ্যপুস্তক রচিত হচ্ছে। যেসব পুস্তকের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ জাগে এবং জাতীয় সংহতি দৃঢ় হয়—সে সকল বই পাঠ্য সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

আট।। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি (Co-curricular Activities): সহপাঠক্রমিক নানাবিধ কাজের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণির বিদ্যার্থীদের মেলামেশার সুযোগ দিতে হবে। স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হয় এমন সব নাটকে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করা, ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করা, আন্তঃরাজ্য স্তরে খেলাধুলার আয়োজন করা—এইসব সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির মধ্যে সকলে সকলের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পায়। এর ফলে বিভিন্ন রাজ্যের মানুষের কৃষ্টির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা পরিচিত হয়। বিভিন্ন কৃষ্টির মধ্যে সে বৈচিত্র্য আছে; আবার বৈচিত্র্যের মধ্যেই যে ঐক্য রয়েছে শিক্ষার্থীর মনে এই উপলব্ধি ঘটে।

জাতীয় দিবস পালন (Celebration of National Day)— প্রত্যেক বিদ্যালয়ে তিনটি জাতীয় দিবস—26 জানুয়ারি, 15 আগস্ট ও 2 অক্টোবর উদ্‌যাপন করার আয়োজন করতে হবে। এই উদ্‌যাপনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিগণ অংশ গ্রহণ করবেন। এই দিনগুলির বিশেষত্ব এবং জাতীয় সংহতি স্থাপনের সঙ্গে এই দিনগুলির সম্পর্কে নিয়ে আলোচনায় সকলেই অংশগ্রহণ করবে।

বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, জাতীয়-দিবস পালন, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, পিকনিক, এনসিসি, এসিসি-র সামাজিক শিক্ষা, স্কাউট ও গাইডস্, বিতর্কসভা, আলোচনা-সভা নাট্যানুষ্ঠান, যুব উৎসব ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক চেতনা লাভ করে যার অভিমুখ জাতীয় সংহতির দিকে।

চলচ্চিত্র, ছবি, রেডিয়ো, টিভি প্রভৃতি চাক্ষুষ-শ্রবণমূলক উপকরণগুলির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তি তার তথা জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে জানার সুযোগ পায়।

সময় সময় সামুদায়িক জীবনযাপন (Community living)-এর কর্মসূচি নেওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাদের পরিচিত গণ্ডির বাইরে এসে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধতার ব্যাবহারিক উপযোগিতাকে উপভোগ করতে পারে।

নয়।। গণতন্ত্রের শিক্ষা (Education for Democracy): ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি হল, সাম্য, ন্যায়পরায়ণতা, মৈত্রী, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব। ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সকলের মর্যাদা ও স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা রক্ষায় ভারতীয় সংবিধান প্রতিশ্রুতিবন্ধ। এই প্রসঙ্গে **হুমায়ুন কবীর** বলেছেন—As democratic republic India has abolished all vestiges and vested interest. Our constitution not only offers but generates equality of opportunity to all. Such equality can be realizd only in an atmosphere of justice and fair play. গণতন্ত্রের আদর্শ ও সেই আদর্শ রূপায়ণের ব্যবস্থা সম্পর্কে বিদ্যার্থীদের মনে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করতে হবে। তবেই তারা গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা রাখবে এবং গণতন্ত্রকে মর্যাদা দিতে পারবে। গণতান্ত্রিক শিক্ষা দ্বারাই প্রতিফলিত হতে পারে আমাদের প্রত্যাশিত জাতীয় সংহতির বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ। শিক্ষার্থী তখনই বুঝতে পারবে যে, গণতন্ত্রের মূল্যবোধ ও আদর্শের সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শের কোনো পার্থক্য নেই। এই গণতান্ত্রিক শিক্ষাই দেশের সামাজিক সমন্বয় ও জাতীয় সংহতিকে রক্ষা করতে পারে।

দশ।। ধর্মনিরপেক্ষতার শিক্ষা (Education for Secularism): স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি গৃহীত হয়েছে। ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে ধর্মহীনতা বোঝায় না।

রাধাকৃষ্নণ কমিশন উচ্চশিক্ষাস্তরে সকল ধর্মের সার নীতিশিক্ষার উদার তাত্ত্বিক আলোচনার সুপারিশ করেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সকল ধর্মের মধ্যে ধৈর্য, সহিষ্নুতা, ভ্রাতৃত্ব ও সমন্বয়ের যেসব বাণী রয়েছে, সেসব সম্পর্কে বিদ্যার্থীদের অবহিত করা প্রয়োজন। রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে স্বীকৃতি দেবে না, বরং সকল ধর্মকে নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা দেবে রাষ্ট্র।

এগারো।। শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teachers): জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি ও গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবধারায় শিক্ষক বিশ্বাসী হবেন। জাতীয় সংহতির মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বিদ্যার্থীকে উদ্‌বুদ্ধ করতে হলে শিক্ষককে প্রথমেই জাতি, সম্প্রদায় ও ধর্মগত গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে বিদ্যার্থীদের প্রত্যাশিত আদর্শ, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির

প্রতীক হয়ে উঠতে হবে। তাহলেই সর্বস্তরের শিক্ষাগত কর্মসূচি বিদ্যার্থীদের সহজে স্বাভাবিকভাবে অভিভূত করবে। এমন শিক্ষকই শিক্ষার্থীর রোল মডেল হবেন।

উপসংহার: জাতির প্রতি বিশ্বাস ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিয়ে গড়ে ওঠে জাতীয় সংহতি। জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ হল ছিন্নমূল অস্তিত্ব, সেই মানুষের জীবন বিচ্ছিন্নতার গ্লানিতে দুর্বিষহ। অজ্ঞতা ও কুশিক্ষা বিদ্বেষ ও বিভেদের জন্ম দেয়—জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে যা এক বিরাট অন্তরায়। একমাত্র ঐক্য সংহতির শিক্ষাই সব বাধা দূর করতে পারে।

ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে নিদারুণ অভিশাপ হল দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যই জাতীয় সংহতির পথে বিরাট অন্তরায়। এই দারিদ্র্য মোচনে সহায়ক পরিকল্পনা গ্রহণ করা ও তার সঠিক প্রয়োগের দায়িত্ব অবশ্যই সরকারকে নিতে হবে। প্রয়োজন মতো সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি যুগ্মভাবে কাজ করতে পারে। তবে, পুরো ব্যাপারটি নির্ভর করে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর। নানা সম্প্রদায়, নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানা মতের দেশ ভারতে গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। এর ফলে মানুষের মধ্যে সহানুভূতি, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে উঠবে। **পণ্ডিত নেহরু** জাতীয় সংহতি রক্ষার প্রসঙ্গে বলেছেন— "The goal of our national integration can be arrived at only through a sustained application of love, sympathy and fellow-feeling on a plan of non-violent outlook." পরিশেষে বলা যায়—জাতীয় সংহতি জাতির জন্য যেমনই মঙ্গলদায়ক, সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ জাতির জন্য ততখানি অশুভকারক।

নিজের দেশ বা জাতির প্রতি সত্যিকারের দায়বদ্ধ ও শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিই বৃহৎ অর্থে মানবজজাতির প্রতি সংবেদনশীল হতে পারেন। সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে—জাতীয়তাবোধের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতাবোধের কোনো বিরোধ নেই, বরং এই দুই বোধ হাত ধরাধরি করে চলে। কারণ, জাতীয়বোধ ও আন্তর্জাতিকতা বোধের উৎস একটিই, তা হল জাতীয়তাবোধ।

আন্তর্জাতিকতার অর্থ (Meaning of Internationalism)

এই বিশ্বে বহু মানুষের বাস। ভৌগোলিক পরিবেশ, লোকাচার, লোকনীতি, ভাষা, সংস্কৃতি—এই সবকিছুর বিভিন্নতায় বিশ্ব বৈচিত্র্যময়। কিন্তু বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্যের সুরটি ধ্বনিত, তা হল—প্রতিটি মানুষ এই বিশ্ব সমাজের এক সভ্য। এক সময় ছিল যখন মানবজাতি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে নিজেদের সীমিত জগতের মধ্যেই বাস করত। কিন্তু আজ মানুষের তৈরি সীমানা মানুষই অতিক্রম করেছে নিজের প্রয়োজনে। মানুষ উপলব্ধি করেছে, পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া কোনো জাতি আজ সম্পূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে না। ব্যক্তি কেবল তার রাষ্ট্রের সভ্যই নয়—সে একজন বিশ্বনাগরিক বা World Citizen। বিশ্বনাগরিকতার এই বোধই হল আন্তর্জাতিকতাবোধ বা Internationalism। ব্যক্তিসত্তায় থাকতে হবে আন্তর্জাতিকতাবোধ বা চেতনা যা ব্যক্তিজীবনের পরিধিকে বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর করে, ব্যক্তিমনকে সংকীর্ণতা মুক্ত ও দৃষ্টিভঙ্গিকে উদার করে তোলে।

Oliver Goldsmith বলেছেন—"Internationalism is a feeling that the individual is not only a member of his state, but a citizen of the world." ড. লিউইসের ***(H C Lewis)*** মতে—"আন্তর্জাতিকতাবোধ হল, নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তির পারস্পরিক আচরণ পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের ক্ষমতা।"

দেশ ও রাষ্ট্রসীমা অতিক্রম করে বিশ্বের মানুষ আজ বিশ্বজনের কথা চিন্তা করতে পারছে। আর এই চিন্তার মধ্যেই রয়েছে বিশ্ববাসীর মঙ্গলবার্তা। রাধাকৃষ্ণণ বলেন—"If human race is to survive, we have to subordinate national pride to international feeling." অর্থাৎ মানবজাতির অস্তিত্বকে বজায় রাখতে হলে আন্তর্জাতিক অর্থাৎ বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের ভাবনাকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে। Live and let live—এই মন্ত্রে বিশ্ববাসীকে বিশ্বাস রাখতে হবে।

আন্তর্জাতিকতাবোধের প্রয়োজনীয়তা
(Need for International Understanding)

আধুনিককালে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতির ফলে 'দূর' হয়েছে 'নিকট' আর সেই কারণে দূর-দূরান্তের কোনো কিছুই আজ আর অধরা থাকে না। ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী মানুষ যে প্রান্তেই থাকুক না কেন, অন্য প্রান্তের মানুষকে সে আজ কাছে পায়। বিশ্বের মানুষ পরস্পরের কাছে এসেছে। ফলে নানা ভাষা ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান, জ্ঞানের বিনিময়, পারস্পরিক নির্ভরতা বিশ্ববাসীকে বিশ্বচেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করেছে। মানুষ উপলব্ধি করছে—জীবনকে সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করে তোলার জন্য সমগ্র বিশ্বের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া দরকার। আর তাই প্রয়োজন আন্তর্জাতিকতাবোধকে সমৃদ্ধ করা—যা বিশ্বের ঐক্য ও সংহতিকে রক্ষা করার জন্য অপরিহার্য।

জাতীয়তাবোধ একটি আত্মিক উপাদান বা Spiritual Quality। প্রকৃত দেশপ্রেমের (Patriotism) সঙ্গে জাতীয়তাবোধের কোনো বিরোধ নেই—কিন্তু দেশপ্রেমের মোড়কে উগ্র জাতীয় চেতনা জাতির পক্ষে মারাত্মক। এই বিকৃত জাতীয়তাবোধ বা Nazism or Fascism কোনো অবস্থাতেই কাম্য নয়।

জাতীয়তাবাদ যখন দেশপ্রেমের সঙ্গে সমার্থক, তখন তার মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান থাকে।

1. জাতীয় ঐতিহ্য ও তার উৎকর্ষতার প্রতি যথার্থ আন্তরিক ও শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।
2. জাতির ঐতিহ্যগত দুর্বলতাগুলিকে মুক্তমনে স্বীকার করে নিতে হবে। এবং সর্বোপরি
3. জাতীয় ঐতিহ্য বা সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য প্রত্যেককে সাধ্যমতো কাজ করতে হবে।

উল্লেখযোগ্য যে, দেশ তথা জাতির স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে।

"True patriotism involves three things—a sincere appreciation of the national cultural achievements, a readiness to recognize its weaknesses frankly and to work for its enrichment and an earnest resolve to serve it to the best of one's ability, subordinating individual interests to broader national interests.

ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিশ্বমানবতা ও আন্তর্জাতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বপ্রেম, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ভারতীয় কৃষ্টির অঙ্গ। ভারতীয় শিল্পকলায়, সাহিত্যে, কাব্যে এবং ধর্মে—সর্বক্ষেত্রেই তা প্রকাশমান। ভারতীয় ঐতিহ্য 'বসুধা'কে খন্ড-ক্ষুদ্র করে রাখে নি। তাই সমগ্র বসুধার মানুষ তার আত্মীয় ও কুটুম্ব—'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। তবে ভারতবাসীর

আন্তর্জাতিকমনস্কতা জাতীয়তাবোধকে ক্ষুণ্ণ করে না। আসলে জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতিকতাবোধের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। সংকীর্ণ বা উগ্র জাতীয়তাবোধ যেমন সমর্থনযোগ্য নয়, তেমনি জাতীয়তাবোধ ছাড়া আন্তর্জাতিকতা অর্থহীন। বস্তুত, 'আমার জাতি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি'—এই ধারণা থেকে জাতি বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। 'আমার দেশই সর্বোৎকৃষ্ট'—এই ধারণা অন্য দেশকে অমর্যাদা করতে শেখায়। তাই জাতীয়তাবোধকে উত্তীর্ণ করে আন্তর্জাতিক চেতনা সম্পন্ন হলে মানুষ সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারে।

বর্তমান সভ্যতার সংকট নিরসনে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। পৃথিবীকে যুদ্ধের ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করার জন্য আন্তর্জাতিকতাবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রধানত সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ ও অন্য রাষ্ট্রের প্রতি প্রতিহিংসার মনোভাবের জন্য দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে। মানুষ বিশ্বযুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত্র। আজও মানুষের মনে হিরোসিমা ও নাগাসাকির বিভীষিকাময় স্মৃতি! বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক দোষারোপের মাধ্যমে চলছে ঠান্ডা লড়াই বা Cold war। আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় ব্যাপকভাবে সন্ত্রাসবাদ (Terrorism) প্রকট হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি হয়েছে এক অস্থিরতা যা ক্রমশ বিধ্বংসী রূপ নিচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করবে—এটি সকলের আশঙ্কা। আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া শুধু কাগজ কলমে চুক্তি স্বাক্ষর নয়, এটির প্রতি সব দেশকে আন্তরিক হতে হবে। আন্তর্জাতিক সহনশীলতাই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নিজের দেশ বা নিজের জাতিকে ভালোবাসা খুবই ভালো, তবে অন্য দেশ বা অন্য জাতিকে বিপন্ন করা গর্হিত অপরাধ।

বিশ্বজনীনতার শিক্ষা অন্য দেশ বা জাতির ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনধারা ইত্যাদি সবকিছুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল হতে শেখায়। তাই প্রত্যেক মানুষকে আন্তর্জাতিক বোধসম্পন্ন হয়ে উঠতে হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব সাফল্য বর্তমান পৃথিবীর মানুষকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। পৃথিবীর একপ্রান্ত আজ আর অন্য প্রান্তের কাছে অধরা নয়। এই অর্থেই বলা হয়, পৃথিবী আজ অনেক ছোটো হয়ে গেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ ও দ্রুততর হয়েছে। ফলে স্থানগত ও কালগত নৈকট্য এসেছে। বর্তমানে বিশ্বজোড়া গ্রামের (Global village) কথা বলা হচ্ছে, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি নিজের স্বাধীনতা বজায় রেখে যে-কোনো স্থানে থাকতে পারে। বিশ্বের সম্পদে বিশ্বের সকল মানুষের অধিকার আছে—এই নিশ্চিত চিন্তাধারা Global village-এর ধারণাকে সার্থক করে তুলতে পারে। এর জন্য আন্তর্জাতিকতার বিশেষ প্রয়োজন।

বর্তমানে কোনো জাতি বিচ্ছিন্নভাবে বাস করতে পারে না—প্রতিটি জাতি অন্য জাতির ওপর নির্ভরশীল। তাই পারস্পরিক বোঝাপড়া একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায় যে, কাশ্মীর উপত্যকা বা গাজা ভূখণ্ড বা লেবানন বা জর্ডন বা ইরাকের ঘটনাবলি বিশ্বের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলছে। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি আজ

বুঝতে পারছে—বাঁচতে হলে একসঙ্গো বাঁচতে হবে আর ডুবতে হলে একসঙ্গো ডুবতে হবে (sink or swim together)। অর্থাৎ একটি দেশের বিপদ শুধু সেই দেশেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা অন্যান্য দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিঘ্নিত করে। *K G Saididain* লিখেছেন— "Peace and war have become one and invisible. They are literally global and we are in actual fact living in one world."

এক জাতি এক রাষ্ট্রের ধারণা বর্তমানে এক বিশ্বজনীন ধারণা। সকলের জন্য ন্যায়বিচার, সাম্য, স্বাধীনতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের দাবি আজ সবদেশই স্বীকার করে নিয়েছে। প্রতিটি মানুষের শক্তি-সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ও প্রকাশের জন্য বিশ্ব সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া খুবই জরুরি। আর তাই প্রতিটি দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান একান্তই কাম্য। এর জন্য দেশ ও জাতির সীমানা অতিক্রম করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। আর তা অন্যদেশে আধিপত্য বিস্তারের জন্য নয়, অন্য দেশকে সহযোগী বন্ধু করার জন্য।

বাস্তবে দেখা যায়, উন্নত দেশগুলিতে চলে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা। একদিকে কোটি কোটি টাকা অস্ত্র নির্মাণের জন্য ব্যয়, অন্যদিকে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কোটি কোটি হতদরিদ্র মানুষের অনাহার। বিশ্ব সমাজের এই অপচয় সমগ্র পৃথিবীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্যকে নষ্ট করছে। উন্নয়নশীল দেশগুলি নিরাপত্তার অভাব বোধ করে বিপুল পরিমাণ অর্থ সামরিক খাতে ব্যয় করে। ফলে দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে পারে না। এই অবস্থা সারা বিশ্বকে অস্থির করে তুলছে। অস্ত্র খাতে ব্যয় হ্রাস করে প্রতি দেশের সম-উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তার কথা রাষ্ট্রনায়করা বোধ করছেন। মানব অস্তিত্ব ও সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গিতে (World-outlook) দেশ তথা জাতি তথা সমাজের সমস্যাগুলির ওপর আলোকপাত করতে হবে।

ভারতের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিকতাবোধের বিশেষ প্রয়োজন (India's Special Need of International Understanding)

ভারতীয় চিন্তাচেতনা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতাকে সর্বদাই গুরুত্ব দিয়েছে। তাই আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, চিন, শক, হুন, পাঠান-মোগল—সবাই ভারতীয় জীবনচর্যার সঙ্গে মিশে যেতে পেরেছে। পরমত সহিষ্ণুতা ভারতের পরম ধর্ম। এই মহান বোধের ভিত্তিই হল মৈত্রী ও সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের দর্শন—Philosophy of Love and brotherhood. এই বিশ্বমৈত্রীর বাণী ভারতীয় নৈতিকতার মূলমন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা'র মধ্যে পিতার যে ভাবমূর্তি ফুটে উঠেছে—তা দেশ-জাতি নির্বিশেষে সকল পিতার মধ্যেই বিরাজমান। স্নেহ ও ভালোবাসার বিশ্বজনীন রূপ প্রতিভাত হয় পৃথিবীময় পিতৃত্বে, মাতৃত্বে, ভ্রাতৃত্বে, সর্বোপরি সকল মানবিক সম্পর্কে এক বিশ্বে বহুর অস্তিত্ব। বহুর হিতেই বিশ্বের হিত। আন্তর্জাতিকতার এটাই মূল সুর।

ভারতের বুদ্ধ, অশোক, কবীর, নানক, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, গান্ধিজি ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তায় জাতীয় চেতনার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার বোধ ধরা পড়েছিল। ভাবের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে সমগ্র মানবজাতি যে এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে—এ বোধ ধীরে ধীরে সবদেশেই উপলব্ধ হয়েছে।

ভারত এখন এক গভীর সংকটময় মুহূর্তের মধ্য দিয়ে চলেছে। দেশের চারপাশে শত্রুভাবাপন্ন বিদেশি শক্তি ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠছে। সন্ত্রাসবাদী শক্তি দেশের অভ্যন্তরীণ বিপদ ডেকে আনছে। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশ ভারতের পক্ষে খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে—crying need of the day. পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার পথে মানবতার এই সংকটের মোকাবিলা করতে হবে। ঘৃণা ও বিদ্বেষ বিষে জর্জরিত মানবসমাজে ছড়িয়ে দিতে হবে পারস্পরিক বোঝাপড়ার বাণী। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভেদ আছে, আছে বৈষম্য। কিন্তু এটিই শেষ কথা নয়। এরপর আছে ঐক্য। তাই বিভেদ ও বৈষম্যের মধ্যে এক ঐক্য স্থাপন একান্ত আবশ্যক।

ভারতবর্ষ আন্তরিকভাবে পঞ্চশীলের নীতিতে বিশ্বাসী। তা হল—

1. প্রতিটি দেশের সংহতি ও সার্বভৌমত্বের প্রতি প্রতিটি দেশের পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন—Mutual respect for one another's territorial integrity and sovereignity.
2. অনাক্রমণ—Non-aggression
3. অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা—Non-interference in one another's internal affairs
4. সাম্য ও পারস্পরিক সাহচর্য—Equality and mutual benefit
5. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান—Peaceful co-existence.

নীতিগতভাবে পঞ্চশীলের তত্ত্ব গ্রহণ করলেও অনেক জাতি ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে তা অনুশীলন করে না। ফলে পঞ্চশীলের নীতি বহুলাংশেই আত্মিক উন্নতি ও মূল্যবোধের উত্তরণ ঘটাতে পারেনি। আর এখানেই আন্তর্জাতিকতাবোধের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা।

ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিকতায় গভীর বিশ্বাসী। সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার সকল আন্তর্জাতিক উদ্যোগকেই ভারত স্বাগত জানায়। ভারত UNESCO-র জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিষ্ঠাতা সভ্য এবং ভারতের সঙ্গে UNESCO-র কাজের একটা সুষ্ঠু সমন্বয় আছে। UNO ও তার বিভিন্ন শাখা UNESCO, UNICEF, FAO, WHO, CARE ইত্যাদির সদস্য হয়েও ভারত কল্যাণ, শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ করে চলেছে। বিশ্বের কোনো অস্থিরতায় বা সংকট মুহূর্তে ভারত সর্বদা সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হবার উপক্রম হলে, ভারতবর্ষ তার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে UNO-র নীতির প্রতি নির্দ্বিধায় পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেছে এবং সক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছে।

আন্তর্জাতিকতাবোধ বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা (Obstacles in the way of International Understanding)

আন্তর্জাতিকতাবোধের প্রয়োজনীয়তা ও তার প্রয়োগ বর্তমান বিশ্বে স্বীকৃত হলেও এরে বাস্তবায়িত করার পথে অন্তরায় কম নয়। মানবমন আজও আদিম স্বার্থ, হিংসা-দ্বেষ থেকে মুক্ত নয়। এইসব আদিম প্রবৃত্তি থেকে চরম জাতীয় স্বার্থ, উগ্র জাত্যাভিমান ও আগ্রাসনের মানসিকতা জেগে ওঠে। তাই UNESCO-র মুখবন্ধে বলা হয়েছে—“Since wars began in the minds of man, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed.” অর্থাৎ মানুষের মনে যুদ্ধের যে বীজ নিহিত থাকে, সেই মনেই গড়ে তুলতে হবে শান্তির প্রতিরোধ। যুদ্ধের প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করতে হলে মানুষকে শান্তি স্থাপনের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বিধ্বংসী প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রত্যেক মানুষকে নিজের অন্তরের শোধন প্রক্রিয়ায় শামিল হতে হবে।

বিজ্ঞান জড় জগতে বিপুল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু মানুষের মানসলোকে তেমন পরিবর্তন আনতে পারেনি। বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তির বিপুল উন্নতি মানুষকে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে, কিন্তু মানুষকে মানুষের হাত ধরে চলতে শেখায়নি। তাই, মতান্তর থেকে মনান্তর আর মনান্তর থেকে শত্রুতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশপ্রেমের নামে জাতিগত উগ্রতা, পরকে শোষণ ও হস্তক্ষেপের প্রয়াস, অর্থনৈতিক অনুদারতা, ভাষা-জাতি ও কৃষ্টিগত দ্বন্দ্ব, সাম্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের লড়াই, ফ্যাসিবাদ ও সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি উপাদান বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিকতাবোধের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের পথে বিঘ্নসৃষ্টিকারী উপাদানগুলি হল—

প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা (Physical & Geographical Isolation)

প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে বিভিন্ন জাতি স্বতন্ত্রভাবে বসবাস করছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি সত্ত্বেও সুবিশাল এই পৃথিবীর ছোটো একটি ভূখণ্ডের এক প্রান্তের মানুষের পক্ষে অন্য প্রান্তের মানুষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা কষ্টসাধ্য। এইসব প্রত্যন্ত ভূখণ্ডের মানুষজন নিজেদের বিচ্ছিন্ন বোধ করে।

রাজনৈতিক বাধা (Political Obstacle)

বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ—গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ ও সমাজতন্ত্র ইত্যাদি মতাদর্শগত বিরোধিতার কারণে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। বিভিন্ন মতাদর্শের সংঘাতে বিশ্বভ্রাতৃত্বের মূল উদ্দেশ্যটি গৌণ হয়ে পড়ে।

অর্থনৈতিক বাধা (Economic Barriers)

বিভিন্ন জাতির মধ্যে আছে বিরাট আর্থিক বৈষম্য। এই আর্থিক বৈষম্য থেকেই জাতিগত বৈষম্যের সৃষ্টি। এই বৈষম্য স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিকতার পূর্ণ বিকাশকে ব্যাহত করে।

ধর্মীয় বাধা (Religious Barriers)

হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি নানা ধর্মের নানা বিশ্বাস ও আচার-আচরণের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ফলে বিরোধ ও সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। এইভাবে ধর্মীয় বাধা বিশ্বশান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বোধ গঠনে সংকটের সৃষ্টি করে।

মনোবৈজ্ঞানিক বাধা (Psychological Barriers)

স্বার্থপরতা, লোভ, ঈর্ষা, ক্ষমতার প্রতি আসক্তি, আগ্রাসী মনোভাব ইত্যাদি মানসিক দৈন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে। বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বশান্তির মূল স্তম্ভ হল মানসিক উদারতা তথা মানবিকতা। মানবমন যদি উক্ত দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত না হয়, তবে বিশ্বের ঐক্য সংহতির ধারণা শুধু কথা কথা হয়েই থাকবে, মানুষের এই পৃথিবীতে তা বাস্তবায়িত হবে না। বিশ্বশান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সামাজিক বাধা (Social Barriers)

লোকাচার, লোকনীতি, জীবনশৈলী, ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পটভূমিতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভেদ দেখা যায়। কিন্তু প্রত্যেক জাতি যদি তার নিজের জাতির বিশিষ্টতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অন্য জাতির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট না থাকে, তবে বিরোধিতার সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক জাতিই যদি তার নিজের জাতির প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাহলে জাতি-বিদ্বেষ দেখা দেবে। বিভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করার পথে এটি গুরুতর অন্তরায়।

সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ (Narrow Nationalism)

সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ খুব মারাত্মক। কারণ এই মতাদর্শে কোনো এক জাতির অন্তর্গত মানুষের মনে অন্য জাতির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের জন্ম দেয়। দেশের মধ্যে জাতিতে জাতিতে, মানুষে মানুষে বোঝাপড়া নষ্ট করে। Narrow or parochial nationalism আন্তর্জাতিকতাবোধে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের নেতৃত্বে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ পরিপুষ্ট হয়।

শিক্ষাগত বাধাসমূহ (Educational Barriers)

বিভিন্ন দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। যেমন ইতিহাসের কোনো ঘটনা ও তার ব্যাখ্যা হয়তো এমনভাবে পড়ানো হয় যাতে বিদ্যার্থীর মধ্যে জ্যাত্যাভিমান, জাতিবিদ্বেষ ইত্যাদি জাগ্রত হয়। এই বিদ্বেষ থেকে অনেক সময় এক দেশের প্রতি অন্য দেশের, এক জাতির প্রতি অন্য জাতির বা এক ধর্মের প্রতি অন্য ধর্মের বিরূপতা জন্মায়। আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে এটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

আন্তর্জাতিকতার বিকাশে শিক্ষার নীতি
(Principles of Education for International Understanding)

1994 সালে জেনিভাতে শিক্ষার চুয়াল্লিশতম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল আন্তর্জাতিক চেতনার উন্মেষের জন্য শিক্ষার ভূমিকা। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান শিক্ষার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়াকে কীভাবে সার্থক করে তোলা যায়—তার ওপর আলোকপাত করেছে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিকতা বিকাশের পথে অন্তরায়গুলি দূর করায় প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়।

UNESCO আন্তর্জাতিক মেলবন্ধনের ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্বের কথা বলেছে। আন্তর্জাতিকতাবোধের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা হল—International understanding is the ability to observe critically and objectively and apprise the conduct of men everywhere to each other, irrespective of the nationality or culture to which they may belong. এই চেতনার সৃষ্টি হয় সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ-কামনা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। আন্তর্জাতিকতা বা Internationalism হল বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বিশ্বনাগরিকতা ও বিশ্বশান্তির ঐক্যরূপ। মানবপ্রীতি এই ঐক্যরূপকে সমৃদ্ধ করে। নানাভাবে এই বোধের উন্মেষ করা সম্ভব। এক হিসেবে, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের অনুকূল। কারণ চারিদিকে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়া হিংসা ও অবিশ্বাস বিশ্বশান্তিকে বিপন্ন করে তুলেছে। দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে সর্বত্রই এক যুদ্ধং দেহি মনোভাব। নিরাপত্তার অভাবে মানুষ সবর্দাই অস্থির ও আতঙ্কিত। তাই বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কগণ বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের চিন্তাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। তাঁদের আশা শিক্ষার মাধ্যমেই এ মহান উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। UNESCO প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় বলা হয়েছে—“Education like any other institution of society, has a special purpose to fulfil, and must, therefore, serve always the changing and increasingly complex needs of the modern world.”

আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশসাধন শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। আন্তর্জাতিকতার মনোভাবকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিফলিত করতে হলে শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি মূলনীতি গ্রহণ করতে হবে।

1. **বিভিন্ন দেশের কৃষ্টির জ্ঞান (Knowledge of different culture):** আন্তর্জাতিকতাবোধ বিকাশের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত জ্ঞান। প্রতিটি বিদ্যার্থীকে জানতে হবে নানান দেশের নানান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি—যার প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতির উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। শুধু নিজের দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞাত হলেই চলবে না—অন্য দেশের ইতিহাস, কৃষ্টি, জীবনধারা ইত্যাদিকে জানার মধ্যে দিয়ে জ্ঞানের বিস্তার ঘটে, বিদ্যার্থীর মনের পরিধিও বিস্তৃত হয়।

2. **জ্ঞানের প্রয়োগ (Application of knowledge):** বিভিন্ন দেশের কৃষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োগ না ঘটলে সেই জ্ঞান অসার ও অর্থহীন। বিদ্যার্থীরা যাতে আন্তর্জাতিকতার আদর্শ জীবনে প্রতিফলিত করতে পারে, তার সুযোগ দিতে হবে। অন্য জাতির ধর্মবিশ্বাস ও আচার-আচরণের প্রতি তারা যেন সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল হতে পারে—সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।
3. **যুক্তিমূলক চিন্তার বিকাশ (Development of logical thought):** শিক্ষার্থীর চিন্তনের ক্ষেত্রকে সংকীর্ণতামুক্ত করে তুলতে হবে। সংস্কারমুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া যুক্তিমূলক চিন্তার বিকাশ ঘটে না। যে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজের মনের বিস্তৃতি ঘটাতে পারবে—সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। সংকীর্ণতায় আবদ্ধ মনে চিন্তাভাবনাও বদ্ধ জলাশয় সদৃশ। মনই চিন্তা করতে পারবে—বিশ্ব শান্তিই কল্যাণের একমাত্র পথ, আর শান্তি না থাকলে সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব হয় না। যুক্তিবাদী মন, বিচারবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি জাগিয়ে তোলাই তাই শিক্ষার লক্ষ্য হবে।
4. **উদার জাতীয়তাবোধ (Noble National feeling):** সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ নয়, শিশুদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে উদার জাতীয়তাবোধ। একমাত্র শিক্ষাই পারে বিদ্যার্থীর মধ্যেকার উগ্র জাতীয়তাবোধকে দূর করতে। বিদ্যার্থী অবশ্যই দেশের গৌরবে গৌরববোধ করবে, কিন্তু একই সঙ্গে অন্য দেশের কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। শিক্ষার কর্মসূচি এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে সমগ্র বিশ্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা কোনোভাবেই বিঘ্নিত না হয়। শিক্ষার নীতি হবে জাতীয়তাবোধের সম্প্রসারণ ও আন্তর্জাতিকতাবোধের জাগরণ। বিদ্যার্থীকে এমনভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে যার দ্বারা সে নিজেই উপলব্ধি করবে—বিশ্বপ্রেম ও দেশপ্রেমের মধ্যে কোনো বিরোধিতা নেই।
5. **যৌথ দায়িত্ব (Common responsibility):** বিদ্যার্থীর মধ্যে এক বোধ জন্ম নেয়। এই বোধ থেকে সে উপলব্ধি করে— বিশ্বমানব পরিবারের (Federation of Mankind) সে-ও একজন সভ্য। বিশ্বের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তার জীবনও জড়িত। বিশ্বের কল্যাণই তার কল্যাণ। বিদ্যার্থী বুঝতে শেখে, মানবতার মানচিত্রে সব রাষ্ট্র একসূত্রে গাঁথা। প্রত্যেক রাষ্ট্রই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। বিশ্বকল্যাণের মহাযজ্ঞে প্রতিটি রাষ্ট্রেরই মহান দায়িত্ব রয়েছে। রীতিনীতি, আচার-আচরণ, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতির দিক থেকে জাতিতে জাতিতে নানা বৈষম্য থাকলেও মানবজাতির অঙ্গীভূত হওয়ায় তারা অখণ্ড। শিক্ষার শুরু থেকেই এই সত্য বিদ্যার্থীর মনে বদ্ধমূল করে দিতে হবে। দুর্ভিক্ষে, প্লাবনে, ভূমিকম্পে ও অন্যান্য দুর্যোগে এজন্যই বিপন্ন রাষ্ট্রের সাহায্যার্থে অন্য রাষ্ট্রগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ে। সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে—এই বিশ্বাস পৃথিবীর যে-কোনো মানুষকে যৌথ দায়িত্ব পালনে উদ্‌বুদ্ধ করবে।

6. **মানব অধিকার (Human rights):** বর্তমানে মানবিক অধিকার সম্পর্কে সকলেই সচেতন। নিজস্ব অভিরুচি ও বিশ্বাস অনুযায়ী বাঁচার অধিকার সকলের কাছেই কাম্য। এই মানবিক অধিকারের বিষয়টিকে সফল করার জন্য বিশ্বশান্তিকে বজায় রাখতে হবে। আবার বিশ্বে শান্তি স্থাপনের জন্য মানব অধিকারের বোধকে যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে। এরা একে অন্যের পরিপূরক। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রতীতি যতই স্পষ্ট হবে ততই বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তি দৃঢ় হবে। সকলের আশা—পৃথিবীর মানুষ এক প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শান্তিতে বসবাস করবে। এই সূত্রে বলা যায়, মানুষের সঙ্গে মানুষের, জাতির সঙ্গে জাতির এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের মহামিলনের স্বপ্নকে সার্থক রূপ দিতে পারে উদার ও মানবিক শিক্ষা।

আন্তর্জাতিকতা সৌহার্দ্যের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা
(Role of Teacher for International Understanding)

আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা যত উচ্চ মানেরই হোক না কেন—তাঁর মুক্ত ও উদার মানসিকতা, আন্তরিকতা, যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও সত্যকে গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকা খুবই জরুরি। যে শিক্ষক এইসব গুণের অধিকারী তিনিই শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যের বোধ সৃষ্টি করতে পারেন।

যথার্থ শিক্ষক বিদ্যার্থীর সামনে তুলে ধরবেন নানা তথ্য। এইসব তথ্য জানার মধ্য দিয়ে বিদ্যার্থীর বিশ্ব সম্পর্কে পরিচয় হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও দেশবাসী সংক্রান্ত সত্য ঘটনা, সত্য তথ্য ও প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে শিক্ষকই বিদ্যার্থীর মনের সংকীর্ণ ধারণাগুলির অপসারণ করতে পারেন। বিদ্যার্থীকে বৈজ্ঞানিক চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করে তাকে জাগতিক ঘটনাবলির যৌক্তিক বিশ্লেষণে আগ্রহী করে তুলতে হবে। এ কথা স্মরণীয়—কোনো দেশ বা জাতির ক্ষতি করার চাইতে নিষ্ক্রিয়তা, ঔদাসীন্য ও অজ্ঞতা হল বড়ো পাপ। শিক্ষা-কমিশনে (1964-66) বলা হয়েছে—The sins are more often now of omission than of active commission. We should, however, guard ourselves against this also, for ignorance is often not less dangerous than hostility—শিক্ষককে এরূপ পাপের বিরুদ্ধে তৎপর হতে হবে।

এক কথায়, শিক্ষক নিজে উদার মনোভাবাপন্ন হয়ে বিদ্যার্থীদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবোধ সৃষ্টি করবেন। বিদ্যার্থীরা সাধারণত শিক্ষক ও তাঁর আদর্শ আচরণকে অনুকরণ ও অনুসরণ করে। সুপরিকল্পিত পাঠক্রম ও সহপাঠক্রমিক কাজ, যেমন—নাটক, বিতর্ক, আলোচনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিক্ষক বিদ্যার্থীর মনে আন্তর্জাতিকতাবোধ ও মানসিক সংহতি গড়ে তোলার কাজে একনিষ্ঠ হবেন—এটি কাম্য।

দলবদ্ধভাবে কাজ করার মধ্য দিয়ে যে 'আমরা-বোধ' (we feeling) তৈরি হয়, তা বিদ্যার্থীর মধ্যে সহযোগিতার অভ্যাস গড়ে তোলে। এই ব্যাপারেও শিক্ষককে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আদর্শ শিক্ষকই শিক্ষার্থীকে বিশ্বনাগরিক করে তোলার মতো দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন। এক বিশ্ব—এক জাতি—এক প্রাণের ঐক্য সুর ধ্বনিত হবে বিদ্যার্থীর মানসলোকে। এই উদ্দেশ্যে পাঠক্রম ও সহপাঠক্রমিক কর্মসূচির মধ্যে আবেগমূলক ঐক্যের উপর জোর দিতে হবে।

The concept of one world—one state and world citizenship is the present international outlook and this should be developed in the minds of the pupils.

উপসংহার: বর্তমান বিশ্বের সংকটমোচন ও কল্যাণসাধনের জন্য দেশ-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে আন্তর্জাতিকতার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এই শিক্ষা শুধু তাত্ত্বিক শিক্ষা নয় অথবা চুক্তি স্বাক্ষর নয়, আন্তরিকতার সঙ্গে প্রয়োগ করার মধ্যেই এই শিক্ষার সার্থকতা।

আন্তর্জাতিকতা বোধ গড়ে ওঠে এক আদর্শের ওপর ভিত্তি করে। এই আদর্শে কোনো প্রকার সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও গোঁড়ামির স্থান নেই। আন্তর্জাতিকতা এক সংবেদনশীল মানসিকতা, এক সার্বিক ধারণা ও বিশ্বাস এবং আন্তরিক প্রয়াসের ধারা বা প্রবাহ। আন্তর্জাতিক চেতনা মানুষের মনে সম্প্রীতি ও শান্তির বীজ বপন করে।

আন্তর্জাতিক সমস্যা বলতে কোনো বিশেষ জাতির সমস্যাকে বোঝায় না, এটিকে সারা বিশ্বের সমস্যা বলে গণ্য করতে হবে। এই সমস্যা সমাধানে বিশ্বের সমস্ত দেশ উপযুক্ত ভূমিকা পালন করবে—এটিই কাম্য। এই উদ্দেশ্য মানবিক মূল্যবোধ ও বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি—এই দুই-ই ব্যক্তি ও সমষ্টির মনে প্রতিফলিত হওয়া দরকার।

বর্তমানে জাতিগত-ধর্মগত-শ্রেণিগত ও রাষ্ট্রীয় মতভেদের প্রকাশ ঘটেছে হিংসাত্মক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে। পরমত সহিষ্ণুতার অভাব থেকে জন্ম নিচ্ছে শত্রুতার সম্পর্ক। এরই মধ্যে উন্নত দেশগুলি উন্নতির শিখরে ওঠার জন্য অসম প্রতিযোগিতায় মত্ত হয়ে

উঠেছে। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব দেশেই বাজেটের সিংহভাগ অর্থ বরাদ্দ হয় অস্ত্র নির্মাণে ও অস্ত্রক্রয়ে আর তা হয় দরিদ্র মানুষকে আহার, আরোগ্য ও আশ্রয়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। নিজের দেশকে নিশ্চিত সুরক্ষা দিতে গিয়ে আজ সব দেশই নিরাপত্তাহীনতার শিকার হচ্ছে।

স্বভাবতই আন্তর্জাতিকতার শিক্ষা আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর সব দেশের মানুষ ক্রমশ উপলব্ধি করছে—নিজের অস্তিত্বকে টিঁকিয়ে রাখতে হলে অন্যের অস্তিত্বকে অক্ষত রাখতে হবে। ‘পশ্চাতে ফেলিছ যারে সে তোমার পশ্চাতে টানিছে’—এই মহাবাক্যকে মনে রেখে বিশ্বজনীনতা ও আন্তর্জাতিকতার প্রশস্ত অঙ্গানের দিকে সকলকে এগিয়ে যেতে হবে।